

# বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম

মনোরঞ্জন সরদার





রাজপুত্র সিদ্ধার্থ কঠোর সাধনা করে  
কীভাবে ঋষি গৌতম হয়ে উঠেছেন  
এবং মানবতাবাদের স্পষ্ট প্রশান্ত মহিমা  
প্রকাশ করে মহামানব বুদ্ধদেব  
হয়েছেন তারই ইতিবৃত্ত রয়েছে।  
বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্বগুলি সম্পর্কে  
সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।  
একদিন এই ধর্ম ভারতবর্ষ তথা  
বঙ্গদেশের নানা প্রান্তে বিস্তার  
হয়েছিল। তবুও বিচিত্র বিভাজন,  
মতবিরোধ, ধর্মের মধ্যে ইন্দ্রিয়  
সন্তোগের প্রাচুর্য, পৌরাণিক ধর্মের  
পুনরুত্থান, রাজ-আনুকূল্যের অভাব  
এবং মুসলিম ধর্মের আগ্রাসন কিভাবে  
বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহ্য অপসৃত হয়ে  
গেল তারই ইতিহাসনিষ্ঠ বিবরণ  
রয়েছে এই গ্রন্থটিতে।

## বুদ্ধদেবের প্রতি

ঐ নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে  
তব জন্মভূমি।

সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে  
দান কর তুমি।

বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহা জাগরণ  
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ-আবরণ—  
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ  
নব প্রাতে উঠুক কুসুমি।

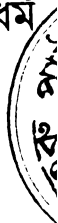
চিন্তা হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,  
আয়ু কর দান।

তোমার বোধনমস্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু  
হোক প্রাণবান্।

খুলে যাক রুদ্ধ দ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি  
ভারত-অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,  
অমেয় প্রেমের বার্তা শত কণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি—  
এনে দিক অজেয় আহ্বান।

দার্জিলিং, ২৪ অক্টোবর ১৯৩১ (১৩৩৮)  
সারনাথে মূলগন্ধকুটিবিহার-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে রচিত

বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম



মনোরঞ্জন সরদার

মুম্বাই

BHUDDHADEV O BAUDDHADHARMA

by

Monoranjan Sardar

ISBN 978-93-81858-43-4

প্রথম প্রকাশ

বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক

প্রকাশক

গুণেন শীল

পত্রলেখা

১০ বি কলেজ রো

কলকাতা ৯

চলভাষ : ৯৮৩১১১০৯৬৩

বর্ণসংস্থাপন

অক্ষরবৃত্ত

কলকাতা ৫৬

মুদ্রণ

ভারতী অফসেট

কলকাতা ১১৮

প্রচ্ছদ

মৃণাল শীল

দাম

১২০.০০

নাট্য গার

৬০০

১২/০৫/২০১৭

বাহ্যিক

আমার পরমপ্রিয় ঠাকুরদাদা  
ঔকেশবচন্দ্র সরদারকে

একদা বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় উপমহাদেশের আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপ্ত ছিল। এমনকি দেশের সীমা ছাড়িয়ে পৃথিবীর মানচিত্র ছুঁয়েছিল এই ধর্ম। বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বদর্শন, কল্যাণময় বাণী প্রভাবিত করেছে মানবসমাজকে। তবে মানুষ মুগ্ধ ও প্রশান্ত হয় তাঁর আশ্চর্যসুন্দর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে। কবির কল্পনায়, শিল্পীর তুলিতে, ভাস্করের স্থাপত্যে বুদ্ধমূর্তি এমন এক মানবীয় অথচ আশ্চর্য অপার্থিব সৌম্যরূপে উদ্ভাসিত যে যুগ যুগ ধরে মানুষ বিনম্র হয়েছেন তাঁর কাছে। ভারতবর্ষে আজ বৌদ্ধধর্ম প্রায় নেই; তবু ভারতীয় মনে দীপ্ত হয়ে রয়েছেন বুদ্ধদেব।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণার প্রয়োজনে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করতে হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজ ও সাহিত্যে এই ধর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করেছি। কারণ একটা সময় বঙ্গদেশের অধিকাংশ মানুষ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে আপন ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছিল। অবশ্য রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বহু কারণে বৌদ্ধধর্ম লোপ পায়। কিন্তু মানুষের অন্তরে, ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারে রয়ে যায় এই ধর্ম। সেই আগ্রহ থেকেই আমার গবেষণা। তবে এই গ্রন্থটিতে গবেষণার ভার নেই। এই গ্রন্থে কেবলমাত্র রাজপুত্র সিদ্ধার্থের বুদ্ধদেব হয়ে ওঠার কথা, বৌদ্ধধর্মের মূল ভাবনা এবং পরিণতির কারণগুলি সাধ্যমত আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত, বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মকে অনুভব করার আগ্রহ থেকে এই রচনা।

গ্রন্থটি নির্মাণ করার জন্য নিয়মিত পরামর্শ দিয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক রমেনকুমার সর। গ্রন্থপ্রকাশের গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন মাননীয় শ্রী গুণেন শীল মহাশয়। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সুন্দার আন্তরিক সহায়তায় এই ছোট্ট গ্রন্থটি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কৃতজ্ঞতার উদ্দেশ্যে তিনি। তবে পাঠক সমাজের ভালোবাসা পেলে তবেই সার্থক হবে এই সৃষ্টিপ্রয়াস।

মনোরঞ্জন সরদার

## সূচিপত্র

ভূমিকা

রাজপুত্র সিদ্ধার্থ থেকে গৌতম বুদ্ধ

বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন

বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস



## ভূমিকা

প্রাচীন ভারতবর্ষে জ্ঞানসাধনা ও দর্শনচর্চার সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। এই দেশে বিভিন্ন সময় বিশেষ প্রজ্ঞার অধিকারী সাধকগণ তাঁদের ধর্ম ও দর্শন দিয়ে সুরভিত করেছেন সমাজ-সংসারকে। তবে আর্যায়নের পর থেকে ভারতীয় ধর্মনির্ভর সংস্কৃতির ধারা প্রধানত তিনটি পথ ধরে এগিয়েছে — আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের পথ ধরে, বাহ্য আচারনিষ্ঠাকে গুরুত্ব দিয়ে এবং মানব-সত্য বা মানবধর্ম প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। ধর্ম যখন আধ্যাত্মিকতা, মহৎ কল্যাণ ও মানবধর্মের পথে অগ্রসর হয়ে সমাজকে সঙ্গে নিয়েছে তখন তার বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু ধর্মের মধ্যে যখন প্রবেশ করেছে সংকীর্ণতা, স্বৈচ্ছাচার ও লোভ — তখনই দ্রুত অবক্ষয় ঘটেছে সেই ধর্মের। মানুষের মঙ্গলের জন্য যে ‘ধর্ম-সংস্কৃতি’ — তার মধ্যে সমাজের একাংশের স্বার্থপরতা ও আত্মসর্বস্বতার হীন মানসিকতা ক্রিয়াশীল হলে, সেই ধর্মে সংকট তৈরি হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বারবার বিভিন্ন ধর্ম এই সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত এদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রবল সমৃদ্ধি ঘটলেও এক সময় অন্তরালে চলে যায় এই ধর্ম। ধর্ম-সংস্কৃতির এমন বেদনাময় পরিণতি পৃথিবীর ইতিহাসে কদাচিৎ ঘটে থাকে। অথচ প্রাচীন ভারতবর্ষের জনমানসে একদা আসমুদ্র হিমাচল ধ্বনিত হয়েছিল এই আত্মনিবেদন — ‘বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি / সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি / ধর্মং শরণং গচ্ছামি।’ এরপর ক্রমশ ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়িয়ে বিশ্বমানবধর্মে পরিণত হয়েছিল মহান বৌদ্ধধর্ম।

ইতিহাসের সাধারণ ধারণা অনুযায়ী প্রাক-আর্য জাতির বাসভূমি ছিল আদি ভারতবর্ষ। তবে খ্রিস্টপূর্ব যুগে আর্যদের আগমন ঘটে এদেশে। স্বাভাবিক নিয়মে শক্তির দ্বন্দ্ব ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিন চলেছিল আর্য ও প্রাক-আর্য জাতির মধ্যে। ক্রমশ বৈদিক সভ্যতা ‘ভারতীয় উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের’ সীমা অতিক্রম করে ‘পূর্ব ভারতের গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী ভূ-ভাগে স্থানান্তরিত’ হয়েছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-এ ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য এই পাঁচটি ভৌগোলিক বিভাগের কথা বলা হয়েছে। বিদ্যমান পরবর্তী দক্ষিণ ভারতে তখন সবে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছিল। পূর্বাঞ্চলে উত্তর বিহারের বিদেহ, পূর্ব বিহারের অঙ্গ এবং দক্ষিণ বিহারের মগধ তখন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে এসেছিল।’ কৃষি নির্ভর এই সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানচর্চায় মগ্ন হয়েছিল বৈদিক যুগের মানুষ। আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রচিত হয়েছিল বেদ, আদি উপনিষদগুলি, ব্রাহ্মণ সাহিত্য ও আরণ্যক। তবু এই সমৃদ্ধির অন্তরালে জাতিভেদ, বর্ণভেদ ও অন্যান্য কারণে বৈদিক ধর্মের ঔজ্জ্বল্যের আলো অপসৃতমান হয়। বাহ্য আচার, যাগ-যজ্ঞ, আড়ম্বর অনুষ্ঠানের প্রাধান্য দেখা যায়। বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি সংবেদনশীল মানবমন শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়ে। ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘বুদ্ধের সমসাময়িককালে বিদ্বিসার এবং অজাতশত্রুর নেতৃত্বে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক শক্তিরূপে মগধের উত্থান ঘটেছিল। দেশের এক বৃহৎ অংশ জুড়ে একটি কেন্দ্রীয় শক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পণ্য চলাচলের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ এর সুযোগ নিতে পারেনি। ফলে মুষ্টিমেয় মানুষের কুক্ষিগত হয় ধনসম্পদ এবং সমাজে ধনবৈষম্য আরও বেড়ে যায়। গতানুগতিক সমাজব্যবস্থা এই

সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। সমাজের বেশিরভাগ মানুষ, যারা গরীব, তারা হতাশায় ভুগছিল। প্রকৃত সুখ ও শান্তিলাভের উপায় সন্ধান করে করে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সমাজের উঁচুতলার রাজা ও তার আত্মীয়বর্গ সমাজে এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য মেনে নিতে পারেননি। রাজপুত্র সিদ্ধার্থের কাছে সমাজের বিভিন্ন অংশের এই অসন্তোষের কথা অজানা ছিল না।<sup>১২</sup> যেকোনো সমাজ বিপ্লব বা ধর্ম বিপ্লবের কারণ একটা অবশ্যই অর্থনৈতিক সংকট। তবুও এই সময়ে আধ্যাত্মিক বিষয়ে যে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য মেনে নিতে পারছিলেন না সমাজের একটা বড়ো অংশ — এই বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য গ্রন্থগুলি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, ব্রাহ্মণদের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত যাগ-যজ্ঞ, আচার-অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সমাজের ব্রাহ্মণ্যের তিনটি বর্ণের (বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র) ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে যাগ-যজ্ঞাদির ব্যয়ভার বেড়েছিল। স্বাভাবিক কারণে আচার সর্বস্বতার বিরুদ্ধে মানুষের মন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আর এই আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ রাজ্যসুখ ত্যাগ করে সত্য ও ধর্মের পথে কঠোর সাধনা করে গৌতম বুদ্ধ হয়েছেন। মানুষের কল্যাণের জন্য মানবধর্মের মূলকথা উচ্চারণ করেছেন —

উত্তিট্ঠে নল্পম্ভ্জ্য্য ধম্মং সুচরিতং চরে,  
 ধম্মচারী সুখংসেতি অস্মিংলোকে পরম্হি চ।  
 ধম্মং চরে সুচরিতং ন তং দুচ্চরিতং চরে।  
 ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিংলোকে পরম্ হি চ।

উঠ, অলস হইয়া থাকিও না, সৎ ধর্ম আরচণ কর। ধর্মচারী ইহ এবং পর উভয় লোকেই সুখে থাকেন। সদ্ধর্ম (সু-ধর্ম) আচরণ করিবে, অসদ্ধর্ম (পাপকর্ম) আচরণ করিবে না; ধর্মচারী উভয়লোকে সুখে থাকেন।<sup>১৩</sup> সেই সঙ্গে তিনি এও ঘোষণা করেন ধর্মপালন ও ধর্মগ্রহণে প্রতিটি মানুষের

সমান অধিকার আছে। জন্ম-ই মানুষের অবস্থান বা সামাজিক মর্যাদা চিহ্নিত করে দেয় না, সুকর্ম, সৎ আচরণ মানুষের ব্রাহ্মণ্যত্ব দান করে —

ঝায়িং বিরজমাসীনং কতকিচ্চং অনাসবং,  
উত্তমখং অনুপ্পত্তং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং।  
যস্ম কায়েন বাচায় মনসা নখি দক্কতং,  
সংবুতং তীহি ঠানেঠি তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং।

যিনি ধ্যানশীল, আসক্তিহীন, একাকি অবস্থিত, কর্তব্যে অবিচল, পাপ বিমুক্ত অর্হৎ পদপ্রাপ্ত এইরূপ লোককে আমি ব্রাহ্মণ বলি। যাহার কায়-মন ও বাক্যে পাপ নাই, যিনি এই ত্রিস্থানে অতিশয় সংযমশীল সেই লোককে আমি ব্রাহ্মণ বলি।<sup>১</sup> মানুষের প্রশান্ত ইচ্ছে নতুন পথ পেল। আত্মজাগরণের শক্তি মাটি পেল। উপেক্ষার বেদনা হয়তো কিছুটা মুছে গেল। ব্রাহ্মণ (সারিপুত্ত, কাশ্যপ, মৌদ্গল্লায়ন), ক্ষত্রিয় (আনন্দ, দেবদত্ত, অনিরুদ্ধ), বৈশ্য (যশ, তপস্সু, ভল্লিক), শূদ্র (ক্ষৌরকার পুত্র উপালি)— চার বর্ণের মানুষ সাধনায়, জ্ঞানচর্চায় সমান অধিকার লাভ করেন। অন্তত বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মে পরিণত হলে সাধারণ সমস্ত বর্ণের মানুষ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার সামর্থ্য অর্জন করেন।

ভারতবর্ষে বৈদিক সমাজে ও সংস্কৃতিতে বেদান্ত দর্শনের প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি। তবে বেদের আচারনিষ্ঠতাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল জৈমিনির পূর্বমীমাংসা দর্শনে। সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে মানুষের কর্তব্য বেদের কর্মকাণ্ডকে যথাসম্ভব নিষ্ঠা সহকারে পালন করা। এই অনুষ্ঠান সর্বস্বতা, বর্ণভেদের অহংকার এবং অবমাননা সমাজে গভীর বিভাজন বা ভেদরেখা তৈরি করে দিয়েছিল। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য রাজশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার অলিখিত অধিকার অর্জন করেছিল। এই সময় থেকে কোথাও রাজশক্তি কিংবা বৈশ্যদের অপ্রকাশ্য সমর্থনে বেদ বিরোধী

বা ব্রাহ্মণ্য বিরোধী প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অবশ্য পরমসৌগত বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বে প্রতিবাদী প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মমতগুলি প্রবল হয়ে ওঠার সামর্থ্য অর্জন করেনি। তবে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক কালে তাঁদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এমনকি, বুদ্ধদেবের পূর্বেও তাঁদের ধর্মমত প্রচার করেছিলেন সাধ্যমত।

এই সব ধর্ম প্রবর্তকদের অধিকাংশই বেদের কোনো না কোনো বিশেষ সত্যকে বা তত্ত্বকে অবলম্বন করে ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। পূর্ণকশ্যপ প্রচার করেছিলেন ‘অক্রিয়বাদ’। তিনি বলতেন আত্মা অক্রিয়, সৎ-অসৎ—সমস্ত কর্মফল ভোগ করে দেহ। মন্সরী গোসালীপুত্র ছিলেন আজীবক সম্প্রদায়ের প্রধান। তিনি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতেন। তাঁর অভিমত, জগতের সমস্ত কিছু ‘নিয়তিসংগতভাব’ অর্থাৎ নিয়তির দ্বারা পরিচালিত। আত্মনির্ভরতা অর্থহীন। জীবন নিয়ন্ত্রণে নিজের কোনো সামর্থ্য নেই। মোক্ষলাভের জন্য জীবগণকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। বুদ্ধদেবের সমসাময়িককালে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ছিলেন অজিত কেশকম্বল। তিনি জড়বাদ প্রচার করেছিলেন। ‘তাঁহার মতে জীব পঞ্চভূতের সমষ্টি মাত্র। অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম — এর সমষ্টি এবং মৃত্যুর পর এগুলি পুনরায় পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়। ড. বড়ুয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, জৈন ভাষ্যকার শীলাংক এবং সায়েন মাধবের আলোচনা হইতে প্রতিফলিত হয় যে অজিতের মতবাদ ও দর্শনতত্ত্ব প্রধানত যাক্সবাক্ষ্যের বিবৃতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। উক্ত মতবাদের সহিত লোকায়াত বা চার্বাক দর্শনের সাদৃশ্যও লক্ষ করা যায়।’<sup>৭</sup> বৌদ্ধ উচ্ছেদবাদের সঙ্গে এই মতবাদের কিছুটা মিল আছে।

আচার্য প্রকুশ কচ্চায়ন বা প্রকুশ কাত্যায়ন শাস্ত্রবাদের (Externalism) কথা বলতেন। তাঁর মতে জগতের যাবতীয় পদার্থ শাস্ত্র ও অব্যয়। তিনি বলেছেন জীবজগৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, সুখ, দুঃখ এবং জীব — এই

সাতটির সমষ্টি। আবার আচার্য সঞ্জয় বেলট্টিপুস্ত অজ্ঞানবাদের প্রবক্তা ছিলেন। কোনো কিছু প্রশ্নের উত্তর সহজভাবে না দিয়ে দ্ব্যর্থক বাক্য প্রয়োগে উত্তর দিতেন কিংবা উত্তর না দেওয়াই ছিল এই মতবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সময় নির্গ্রহ জ্ঞাতপুত্র ছিলেন জৈনধর্মের প্রধান প্রবক্তা। বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি জৈনধর্মই ছিল সবচেয়ে সক্রিয়। তবে সুনিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোয় পরিচালিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপর এই সব ধর্ম খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারেনি। বৌদ্ধধর্মই প্রথম (জৈনধর্মও) বৈদিক সংস্কৃতির ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের শিকড়কে নাড়িয়ে দিয়েছিল। বিশেষ করে ‘সর্বশ্রেষ্ঠ মানব’<sup>১৬</sup> বুদ্ধদেব যখন ঘোষণা করেছিলেন—

অস্তা হি অস্তনো নাথো কো হি নাথো পরো সিয়া।

অস্তনা হি সুদন্তেন নাথং লভতি দুম্মভং।

আপনি আপনার আশ্রয়, উহা ভিন্ন অন্য আশ্রয়দাতা আর কে আছে। আপনাকে সুসংযত করতে দুর্লভ শরণের লাভ হয়।<sup>১৭</sup> তখন মানুষ আত্মপ্রত্যয় ফিরে পায়, অস্তত আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস অর্জনের কথা চিন্তা করে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন — ‘ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছেন।

এমনি করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা মানুষের অন্তরের জ্ঞান, শক্তি ও উদ্যমকে তিনি মহীয়ান করিয়া তুলিলেন।<sup>১৮</sup> মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করলেন বুদ্ধের শ্রীচরণে; বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কল্যাণ কর্মের ও প্রেম ভক্তির মহিমার কাছে। ক্রমশ বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মে পরিণত হয়।

মহারাজা অশোকের সময় বৌদ্ধধর্মের ছত্রছায়ায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ কতকটা নিশ্চিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম বিভাজিত হলেও বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসংস্কৃতি সর্বদা মানবকল্যাণে নিয়োজিত ছিল। বাংলার জনজীবন এই ধর্মের স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। কারণ, বঙ্গদেশে বেদ-নির্ভর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব ছিল না। বৈদিক সাহিত্য সংস্কৃতিতে বঙ্গ, মগধ, চের ও পাণ্ড্য ব্রাত্যভূমি ছিল। বৃহত্তর বঙ্গদেশের সাধারণ মানুষদেরকে তাঁরা পক্ষী, অসুর কিংবা ম্লেচ্ছ বলে অভিহিত করতেন। গবেষকদের অভিমত, বঙ্গদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে সাধারণ মানুষদের মধ্যে বৈদিক বা পৌরাণিক দেবতা-নির্ভরতা ছিল না। আবহমান কালের নিজস্ব সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করতেন তারা। আর তাদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের সাম্যনীতি, অহিংসা, সহজ জীবনদর্শন গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। বঙ্গদেশ সমৃদ্ধ হয়েছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতির উজ্জ্বলতায়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক একমত যে, মহারাজা অশোকের সময় বাংলায় বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটেছিল। তবে গুপ্ত যুগে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসারে বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়। বস্তুত ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ, ইং সিং, শেং চি প্রমুখ পর্যটকদের বিবরণ থেকে পাওয়া তথ্যসূত্রে গবেষকগণ সিদ্ধান্ত করেছেন, পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে পাল রাজাদের সময় পর্যন্ত এদেশে বহু বৌদ্ধবিহার ও লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধদের বসবাস ছিল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মহাবিহার — বিক্রমশীল, সোমপুর, ওদন্তপুরী, পণ্ডিতবিহার, দেবীকোট, বিক্রমপুর, পট্টিক, পো-চি-পো, জগদল-এর মত জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলি। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ রচনা করেছিলেন বহু কাব্য, তত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ। তবুও নবম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ধর্মীয়, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বঙ্গদেশের আলোকবৃত্ত থেকে প্রায় নির্বাসিত হয়েছিল এই ধর্ম। বিশেষ করে সেন, বর্মণ রাজাদের আনুকূল্যে এবং স্মৃতিশাস্ত্রকারদের (হরিবর্মাদেবের মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট, কুমারিল ভট্ট,

জীমূতবাহন, রঘুনন্দন) কঠোর অনুশাসনে ও নিয়ন্ত্রণে বৌদ্ধধর্ম ম্লান হয়ে যায়। অন্যদিকে তুর্কি আক্রমণে বৌদ্ধবিহারগুলি ধ্বংস হওয়ায় এই ধর্মের সংগঠন শক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। ইতিমধ্যে ইসলাম ধর্মের হাওয়া স্পর্শ করেছিল পূর্ব ভারতের বন্দর অঞ্চলগুলিতে। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক অধিকার মুসলমানদের হাতে চলে আসায় ইসলাম ধর্মের প্রতি বিশেষ কতকগুলি কারণে সাধারণ বৌদ্ধসমাজ প্রভাবিত হয়।

### তথ্যসূত্র

১. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভাষান্তর সত্য সৌরভ জানা : বৌদ্ধধর্মের উন্মেষ ভারতে ও বহির্বিশ্বে। প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, পৃ.-১২।
২. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভাষান্তর সত্য সৌরভ জানা : বৌদ্ধধর্মের উন্মেষ ভারতে ও বহির্বিশ্বে। প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, পৃ.-১৪।
৩. শ্রী চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত, সম্পাদনা ড. বারিদবরণ ঘোষ : ধর্মপদ। করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ.-৭১।
৪. শ্রী চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত, সম্পাদনা ড. বারিদবরণ ঘোষ : ধর্মপদ। করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ.-১৬৬।
৫. মণিকুন্ডলা হালদার (দে) : বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস। মহাবোধি বুক এজেন্সি, তৃতীয় মুদ্রণ-১৪১৭, পৃ.-১৩।
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত : বুদ্ধদেব। বিশ্বভারতী ফাউন্ডেশন ১৪১২, পৃ.-৯।
৭. শীলভদ্র ভিক্ষু : ধর্মপদ। মহাবোধি বুক এজেন্সি, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ.-৪৫।
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত : বুদ্ধদেব। বিশ্বভারতী, ফাউন্ডেশন ১৪১২, পৃ.-৫৩।



## রাজপুত্র সিদ্ধার্থ থেকে গৌতম বুদ্ধ

‘বুদ্ধদেব’— পৃথিবীর মানবজীবন ও মানবসভ্যতার ইতিহাসে শাস্বত একটি নাম। কিন্তু সিদ্ধার্থের জীবন ইতিহাসের অনুপুঙ্খ ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য নিয়ে ঐতিহাসিকগণ এবং অধুনা গবেষকগণ একমত হতে পারেননি। কারণ তাঁর জীবনকথা নিয়ে লেখা গ্রন্থগুলি একমাত্র অবলম্বন। অথচ এই গ্রন্থগুলি বুদ্ধের মৃত্যুর বহু পরে রচিত হয়েছে। বস্তুত ভক্তহৃদয়ের গভীর ভক্তিপ্রাণতন্ময়তায় উৎসারিত অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে এইসব জীবনীগ্রন্থে। ফলে নিরপেক্ষ নৈব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেকালে বুদ্ধজীবন কথা রচিত হয়নি। বুদ্ধদেবের বিস্তারিত জীবন কথা প্রকাশিত হয়েছে— ‘ললিতবিস্তার’, ‘বুদ্ধচরিত কাব্য’, ‘লঙ্কাবতার সূত্র’, ‘অবদানকল্পলতা’, ‘মহাবংশ’, ‘দীপবংশ’, ‘মহাপরিনির্বাণ সুত্ত’, ‘মহাবগ্গ’, ‘জাতক’, ‘Fo-pan-hhing-tsi-can’ (চীনগ্রন্থ), ‘Shaka-jitsu-roku’ (জাপানি গ্রন্থ), ‘গ-ছের-রোল-প’ (তিব্বতী গ্রন্থ), ‘মললংগর’ (ব্রহ্মদেশীয় গ্রন্থ) ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে। এই গ্রন্থগুলি অবলম্বন করে বুদ্ধজীবন কথা বিষয়ে বহু বাংলা ও ইংরাজি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আবার মূলগ্রন্থগুলি অনুবাদ করে সম্পাদিত বহুগ্রন্থ রচিতও হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বৌদ্ধবিদ্যা’ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বৌদ্ধধর্ম’,<sup>১</sup> সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের ‘বুদ্ধদেব’,<sup>২</sup> অমূল্যচন্দ্র সেনের ‘বুদ্ধকথা’<sup>৩</sup> ধর্মানন্দ কোসাম্বীর ‘ভগবান বুদ্ধ’,<sup>৪</sup> শান্তিকুসুম দাশগুপ্তের ‘বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ’,<sup>৫</sup> রামদাস সেনের ‘বুদ্ধদেব তাঁহার জীবন ও ধর্মনীতি’,<sup>৬</sup> অঘোরনাথ গুপ্তের ‘শাক্যমুনি চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব’,<sup>৭</sup> কৃষ্ণবিহারী সেনের ‘অশোক চরিত’,<sup>৮</sup> সাধনকমল চৌধুরীর ‘প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ও

গৌতমবুদ্ধ”<sup>১০</sup> অরুণকাস্তি সাহার ‘অমিতাভ বুদ্ধ’,<sup>১১</sup> সাধনকমল চৌধুরীর সম্পাদিত ‘মহাবগ্গ’<sup>১২</sup> ‘চুললবগ্গ’,<sup>১৩</sup> ‘মহাবংশ’,<sup>১৪</sup> ‘থুপবংশ’,<sup>১৫</sup> রেবতপ্রিয় বড়ুয়ার ‘বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব’,<sup>১৬</sup> বিমলাচরণ লাহা সম্পাদিত ‘সৌন্দর্যনন্দ কাব্য’<sup>১৭</sup> ড. জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘বুদ্ধচরিত’,<sup>১৮</sup> (কবি অশ্বঘোষ) — এই গ্রন্থগুলিতে বুদ্ধদেবের জীবনকথার আনুষঙ্গিক তথ্য প্রদানে একমত হতে পারেননি গ্রন্থকারগণ বা সম্পাদকগণ। তবে সিদ্ধার্থ থেকে বুদ্ধদেব হয়ে ওঠার স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন তাঁরা।

শাক্য রাজপুত্র সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। ‘অবদানকল্পলতা’, ‘ললিতবিস্তার’ ও ‘মহাবংশ’-এ উল্লেখিত হয়েছে ‘শুদ্ধোদনের ঔরসে ও মায়ার গর্ভে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। ... খ্রি.পূ. ৬২৩ অব্দে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়।’<sup>১৯</sup> এবিষয় ‘2500 YEARS OF BUDDHISM’ গ্রন্থে লেখা হয়েছে — In the year 623 B.C. his Queen, Mahamaya was travelling in state from Kapilavastu to Devadaha, her parent’s, home, to have her first child. On her way, the queen gave birth to a divine son in the Lumbini grove between two tall sal trees, then in their full spring blossom.<sup>২০</sup> অন্যমতে — তাঁর জন্মের সালটি জানা যায় না — তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে খ্রি.পূ. ৬২৪ সালে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন তাঁর জন্ম।<sup>২১</sup> এই প্রসঙ্গে অঘোরনাথ গুপ্ত লিখেছেন — ‘খ্রীষ্ট শকের ৬২৩ বৎসর পূর্বে বসন্তকালে শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে শাক্য জন্মগ্রহণ করেন। ... তাঁর জন্ম উপলক্ষে বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহলবাসীরা বলেন, খ্রীষ্ট শকের ৫৫৩ বৎসর পূর্বে, চীনদেশীয় ধর্মগ্রন্থে ৯৮৩ বৎসর পূর্বে বোধিসত্ত্ব অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন। যাহা হউক ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা একপ্রকার গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, খ্রীষ্ট শকের ৬০০ বৎসর পূর্বেই তাঁহার জন্ম হয়।’<sup>২২</sup> অতএব খ্রী.পূ.৬২৩ বা ৬২৪ অব্দে

কপিলাবস্তু<sup>১০</sup> ও দেবদহ নগরের মধ্যস্থলে লুম্বিনীবনে বা লুম্বিনী উদ্যানে সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।<sup>১১</sup> তাঁর মাতা মায়াদেবী—সিদ্ধার্থ জন্মের সাতদিন পরে মারা যান।<sup>১২</sup> পিতা শুদ্ধোদন গৌতমগোত্রীয় ও শাক্যবংশীয় ছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে কপিলাবস্তুকে বিশাল রাজ্য ও শুদ্ধোদনকে মহাপ্রতাপশালী বহু ঐশ্বর্যবান রাজারূপে বর্ণনা করা হলেও রাজা শুদ্ধোদন—‘যুগরীতিতে ছোটোখাট রাজা বিশেষ ছিলেন।’<sup>১৩</sup> কথিত আছে সিদ্ধার্থের জন্মগ্রহণের পর রাজজ্যোতিষীগণ গণনা করে বলেছিলেন, সংসারে থাকলে রাজচক্রবর্তী রাজা হবেন অথবা সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী হবেন। রাজ ঐশ্বর্যের মধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন তিনি। আচার্য বিশ্বমিত্রের আশ্রমে শাস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন। ললিতবিস্তার গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে— ‘সিদ্ধার্থ বিবাহের সময়ে বেদ, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, শিক্ষা, কল্প, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, অর্থবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, বারহস্পত্য ইত্যাদি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি গণিতশাস্ত্রবিদ অর্জুন নামক জ্যোতিষবিদ ব্রাহ্মণের নিকট এক হইতে কোটীশতোত্তর গণনা শিক্ষা করিয়াছিলেন।’<sup>১৪</sup>

রাজা শুদ্ধোদন রাজজ্যোতিষীর কথা স্মরণ রেখে মাত্র ষোল বছর বয়সে সিদ্ধার্থকে শাক্যবংশীয় কোলিয়রাজ সুপ্রবুদ্ধের কন্যা স্নিগ্ধা, অনিন্দ্যসুন্দরী ও পরমগুণবতী যশোধরার সঙ্গে বিয়ে দেন। অবশ্য এবিষয়ে মতান্তর রয়েছে। ললিতবিস্তার-এ উল্লিখিত হয়েছে— শাক্যবংশীয় দণ্ডপানীর পরমাসুন্দরী ও গুণময়ী কন্যা গোপার সঙ্গে বিবাহ হয় সিদ্ধার্থের। ‘সংস্কৃত, তিব্বতী, সিংহলী প্রভৃতি গ্রন্থে সিদ্ধার্থের পত্নীর বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। যথা— গোপা, যশোধরা, উৎপলবর্ণা, ভদ্রা, বিশ্বা ইত্যাদি। ‘বিবাহের একাধিক বিবরণ ও পত্নীর বিভিন্ন নাম হইতে মনে হয় সিদ্ধার্থের একসঙ্গে বা ক্রমে ক্রমে একাধিক কন্যার সঙ্গে হয়তো বা বিবাহ হইয়া থাকিতে পারে। সে যুগে ধনীপুত্রের একাধিক বিবাহ

হওয়াই সাধারণ প্রথা ছিল; ক্ষত্রিয় কুমারদের একই দিনে বহুকন্যার সহিত বিবাহ হইত। পত্নীর সহিত তাহার কতিপয় ভগিনী এবং আরও অনেক কুমারী, সখী সহচরী বা পরিচারিকারূপে পতিগৃহে গিয়া সহপত্নীরূপে বাস করার প্রথা সে যুগে প্রচলিত ছিল। যদিও প্রধানা পত্নী একজনই হইতেন।<sup>১৮</sup> রাজা শুদ্ধোদনের নির্দেশে আরাম বিলাস ও ভোগের মধ্যে ডুবে ছিলেন সিদ্ধার্থ। কিন্তু ভোগ কখনও তৃপ্তি দেয় না, আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দেয়। হয়তো এই কারণে বৈরাগ্য জন্মেছিল তাঁর। উপরন্তু ‘বসন্ত সন্ধ্যায় নগর ভ্রমণকালে মানবজীবনের তিনটি অব্যাহত অবস্থা জরা, ব্যাধি ও পরিণামে মৃত্যু তাঁর চেতনাকে নাড়া দিয়ে উঠলো এবং মনে আরও দৃঢ়ভাবে এসব দুঃখের নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে ভাবিয়ে তুলেছিল।’<sup>১৯</sup> সিদ্ধার্থ বলে উঠেছিলেন —

‘ধিগ্ যৌবনের জরয়া সমভিহতেন আরোগ্য ধিক্ বিবিধব্যধিপরাহতেন।

ধিগ্ জীবিতেন পুরুষোণ চিরস্থিতেন ধিগ্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতি প্রসঙ্গেঃ ॥

যদি জর দ ভবেয়া নৈব ব্যাধিন্ মৃত্যুস্তথাপি চ মহদুঃখং পঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো।

কিংপুন জরব্যাধি মৃত্যুনিত্যানুবন্ধাঃ সাধুপ্রতি-নির্বৃত্ত্য চিস্তয়িষে প্রমোচম ॥

যৌবনে ধিক, কারণ জরা ইহার পশ্চাতে ধাবমান। আরোগ্য ধিক, যেহেতু বিবিধ ব্যাধি অবশ্যজ্ঞাবী। জীবনে ধিক, কারণ লোক চিরস্থায়ী নহে। বিজ্ঞ পুরুষকে ধিক, যে তিনি অলীক আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকেন। যদি জরা ব্যাধি ও মৃত্যু না থাকিত তাহা হইলেই লোকের পঞ্চস্কন্ধ ধারণ করিয়া মহাদুঃখ ভোগ করিতে হইত। জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর নিত্যসহচর হইয়া আমাদের যে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি?<sup>২০</sup> জীবন অনুরাগে বীতরাগ সিদ্ধার্থ নগরের দক্ষিণদ্বারে এসে স্নিগ্ধ সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী দেখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। তবে ললিতবিস্তার, মহাবংশ, দীপবংশ গ্রন্থগুলিতে সিদ্ধার্থের সন্ন্যাস গ্রহণের যে কারণ দেখানো হয়েছে, তা সত্য হতে পারে; তবে ভক্তের অনুরাগের চোখে ভগবানের

অপার শক্তির সামর্থ্যকে প্রকাশ করার মোহ আছে। বিশ্ববন্দিত করুণাসাগর সুগত সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন— কেবল যুক্তি ও তথ্য দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, বিচার করে ভক্ত কবি কাব্য রচনা করতে পারেননি; কোনো ক্ষেত্রেই তা সম্ভব নয়। তবে এও সত্য যে, সিদ্ধার্থ কৈশোর থেকেই অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষদের মতই সংসারে সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দের সামিয়ানার নীচে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তাই দেবদত্তের দ্বারা আহত হংসটিকে প্রাণের সহজাত করুণাগুণেই সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন। জীবজগতের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল। জীব-প্রেম ও আত্মঅনুসন্ধিৎসা তাঁকে সন্ন্যাসগ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেছিল। “বুদ্ধদেব নিজে পরবর্তীকালে শিষ্যদিগকে এই কথা বলিয়াছিলেন, ‘হে ভিক্ষুগণ জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর কথা চিন্তা করিয়া যখন আমি দেখিলাম যে, আমিও জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন, তখন আমার মনে হইল যে জরা ব্যাধি মৃত্যুর দর্শনে আমার উদ্ভিগ্ন বা বিরক্ত হওয়া উচিত নহে। জরা ব্যাধি মৃত্যুর কথা এবং আমাকেও এগুলি ভোগ করিতে হইবে — এই কথা চিন্তা করিতে করিতে আমার যৌবনের মদ সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল।’ বুদ্ধ নিজের সংসার বৈরাগ্যের কারণ সম্বন্ধে অন্যান্য স্থানেও অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে যাহা বলিয়াছেন, ইহাই তাহার সারকথা। এই কথা কয়টি বড়ো মূল্যবান ও প্রয়োজনীয়, কারণ ইহা হইতে সিদ্ধার্থের মানসিক অবস্থা ও মনঃপরিবর্তন ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায়।”<sup>১০</sup> তাঁর এই মানস ক্ষেত্রটি তৈরি হয়েছিল বলেই তিনি উচ্চারণ করেছিলেন —

অপরিমিতান্তকল্পা ময়া ছন্দকভুজ্ঞা কামানিমাংরুপশ্চ শব্দাশ্চ ।  
গন্ধারসা স্পর্শতা নানাবিধা দিব্য যে মানুষা নো চ তৃপ্তিরভূৎ ॥  
বজ্রাশনি পরশু শক্তি শরাশ্রাবর্ষে বিদ্যুৎপ্রভানজ্জ্বলিতং কথিতঞ্চ লোহং ।  
অদীপ্ত শৈলশিখরাঃ প্রপতেয়ু মৃগ্নি নো বা অহংপুনর্জনেয়  
গৃহাভিলাষম ॥

হে ছন্দক, আমি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও শব্দ ইত্যাদি নানাবিধ কাম্যবস্তু ইহলোকে দেবলোকে অনন্তকল্প কাল ভোগ করিয়াছি। বজ্র, কুঠার, শর, প্রস্তর, বিদুৎপ্রভাব ন্যায় প্রজ্জ্বলিত লৌহ আগ্নেয়গিরি শিখর ইত্যাদি আমার মস্তকে পতিত হউক, তাহাতেও গৃহস্থাশ্রমে পুনরায় আমার অভিলাষ জন্মাইতে পারিবে না।<sup>৯২</sup>

আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে সারথি ছন্দকের রথে (মতান্তরে প্রিয় অশ্ব কঙ্ককের পৃষ্ঠে আরোহণ করে) রাজপুরী থেকে অভিনিষ্ক্রমণ করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে এবং ইতিহাসে এই ঘটনা ‘মহাভিনিষ্ক্রমণ’ নামে খ্যাত। আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে গৃহত্যাগ করে একে একে শাক্য, কোড্য, মল্ল, মৈনেয় প্রভৃতি জনপদ পেরিয়ে অনোমা (অনামা) নদীর তীরে এসে পৌঁছান।<sup>৯৩</sup> সারথি ছন্দককে বিদায় দিয়ে অনোমা নদীতে স্নান করে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন। কথিত আছে একটি ব্যাধের বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। রাজবেশে তিনি ছিলেন সিদ্ধার্থ; সন্ন্যাসীর বেশে তিনি হলেন গৌতম (পারিবারিক গৌতম গোত্রের নাম অনুসারে)। পদব্রজে পরিত্রমণ করতে করতে বহু সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এরপর বৈশালীর কাছে হিরণ্যবতী নদীর তীরে কালাম গোত্রের প্রাজ্ঞ সাধক আঢ়ার কালামের কাছে সাধনার প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর কাছে শিক্ষা সম্পূর্ণ করে আত্মমুক্তির সন্ধানে রাজগৃহ ও শ্রাবস্তীতে পৌঁছালেন। শ্রাবস্তীতে (গয়া অঞ্চলে) সাধকগুরু রামপুত্র উদ্রকের (উদক রামপুত্র) কাছে শাস্ত্রচর্চা শুরু করেন। গুরু উদ্রক তাকে ‘চতুরঙ্গ কৃচ্ছ্র সাধনার তপোশ্চর্য্যার যথাক্রমে তপস্বিতা, রক্ষবচন, জগুঙ্গা এবং প্রবিষেক — এই চারটি কঠিন নিয়ম পালন করতে বলেন। এই সাধনা রীতির নিষ্ঠায় তিনি দুর্বলতর ও মৃতপ্রায় হয়ে যান। এই কৃচ্ছ্রসাধনা সম্পর্কে তিনি নিজে বর্ণনা করেছিলেন — ‘বলবান ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে যেমন মস্তক বা স্কন্দ ধরিয়া স্ববশে আনে, সেইরূপ আমি দন্তে দন্তে চাপিয়া

তালুদেশে জিহ্বা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া চিস্তকে পেষণ করিবার চেষ্টা করিলাম, আমার কক্ষদেশে স্বেদ নির্গম হইতে লাগিল। চিস্তের অভিনিবেশ অবিচলিত হইলেও দেহ অচঞ্চল হইল না, কিন্তু তথাপি আমি অপরাভূত রহিলাম। আমি মুখ ও নাসিকা দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ করিলাম। বলবান ব্যক্তি তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করিলে যে রূপ হয়, আহত বায়ু সেইরূপ আমার মস্তকে আঘাত করিল। মস্তকে দৃঢ়ভাবে রজ্জু দ্বারা বেষ্টন করিয়া বন্ধন করিলে বা তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা শরীর কাটিয়া ফেলিলে অথবা দুই বলবান ব্যক্তি এক দুর্বল ব্যক্তিকে বলপূর্বক জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর ধরিয়া রাখিলে যে যন্ত্রণাবোধ হয়, আমার সেইরূপ যন্ত্রণাবোধ হইল। আমি অতি অল্প আহার করিতে লাগিলাম ও ক্রমে দিনে একটিমাত্র বদরি বা একটিমাত্র তিল বা একটিমাত্র তণ্ডুল আহার করিতাম। আমার শরীর এইরূপ শুষ্ক হইয়া গেল যে, আমি যেখানে বসিতাম, সেখানে উষ্ট্র পদচিহ্নের মত ছাপ পড়িত, চক্ষুদ্বয় কোটরগত হইয়া গভীর কুপের তলদেশস্থ জলের মত বোধ হইতো, উদর স্পর্শ করিলে মেরুদণ্ড হাতে ঠেকিত, গায়ে হাত বুলাইলে রোম ঝরিয়া পড়িত।<sup>৯৪</sup> তাঁর এই সাধনায় আকৃষ্ট হয়ে সঙ্গী হয়েছিলেন পাঁচজন তাপস।<sup>৯৫</sup> কিন্তু চৈতন্যহীন গৌতমকে দেখে মৃত মনে করে দুঃখ পান তাঁরা। এরপর জ্ঞান ফিরে আসে তাঁর। অনুভব করেন অভীষ্ট লাভ হয়নি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন — ‘আমি বুঝিলাম যে আমার চেষ্টায় ফল হইল না। তখন আমার মনে পড়িল যে, বাল্যকালে আমার পিতা যখন শস্যক্ষেত্রে কর্মব্যস্ত ছিলেন তখন জম্বু বৃক্ষের নীচে বসিয়া আমি কামনা বাসনা বিরহিত সুখ ও আনন্দময় ধ্যানের প্রথম অবস্থায় বিহার করিয়াছিলাম।<sup>৯৬</sup> ত্রিতন্ত্রী বীণার মধ্যমলয়ে তন্ত্রী বন্ধন করিলে যেমন সুললিত সুরধারায় অন্তরলোক আনন্দে মথিত হয়ে ওঠে, তেমনি পতঞ্জলির মধ্যমপট্টা তাঁর সাধনার প্রকৃত পথ হতে পারে — এই সত্য অনুভব করেন। কৃচ্ছ্রসাধনা

ত্যাগ করে সুস্থ সবল শরীরে ও আনন্দময় হৃদয়ানুভূতি নিয়ে ক্রমে ক্রমে ধ্যানের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে প্রবেশ করে শুদ্ধ-শান্ত-সমাহিত ভাব ধারণ করেন। কৃচ্ছ্রসাধনা ও যোগ অভ্যাস তাঁর ইন্দ্রিয়াদি ও মনকে সংহত ও শান্ত করে দিয়েছিল। এরপর যথার্থ সাধনপথ তাঁকে নির্বাণের দিকে দ্বারাবিষ্ট করে। তিনি গভীর অরণ্য ত্যাগ করে ফল্গু নদী ও নৈরঞ্জনা নদীর সঙ্গমস্থলের নিকটবর্তী নৈরঞ্জনা<sup>৭৭</sup> নদীর তীরে পরমজ্ঞান লাভের সাধনায় মগ্ন হন। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন প্রভাতে ‘সেনানি গ্রামের এক ধনবান বণিকের পুণ্যবতী দুহিতা সুজাতা পুত্রলাভের তৃপ্তিতে তাঁকে বৃক্ষদেবতা মনে করে’<sup>৭৮</sup> একবাটি পায়ের নিবেদন করেন। এই প্রসঙ্গে সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত লিখেছেন — ‘নিকটস্থ গ্রাম দুহিতৃগণ এক পরমতপস্বী আসিয়াছেন ও তপস্যায় নিযুক্ত আছেন, শ্রবণ করিয়া পূর্ব হইতেই তদর্শনার্থে সেই আশ্রমে আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বলতপ্তা, প্রিয়া, সুপ্রিয়া, বিজয় সেনা, অতিমুক্তকমলা, সুন্দরী, কুন্তকারী, উল্লবিম্বিকা, জটিলিকা ও সুজাতা এই দশজন নিয়ত আসিতেন। শাক্য যখন কেবল তণ্ডুল বদরী বা তিল ভোজন করিতেন, তখন ইহারাই তাহা যোগাইতেন। এখন আর কঠিন বস্তু শাক্যের গলাধকরণ হইত না বলিয়া তাঁহারা যুষ লইয়া আসিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া যাইতেন। কিন্তু সর্বোশেষে সুজাতাই প্রতিদিন অন্ন মধু পায়ের খাওয়াইতেন। ... উরুবিশ্বের নিকট নন্দিকগ্রামে সুজাতার আভাসস্থল। তিনি অতিশয় সাধবী ব্রতপরায়ণী ও পতিব্রতা নারী ছিলেন। সাধু-সন্ন্যাসী শ্রমণদিগের সেবা না করিয়া করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। এই তাহার এক নিজ ব্রত ছিল।’<sup>৭৯</sup> অবশ্য অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত গ্রন্থে এই নারী নন্দবালা নামে<sup>৮০</sup> নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

সিদ্ধ পরিতৃপ্ত গৌতম সঙ্ঘায় অশ্বত্থ তরুমূলে (বোধিদ্রুমমূলে) ধ্যানমনে বসে এই আপ্তবাক্যে দৃঢ় হলেন—



‘ততঃ স পর্যঙ্কমকম্প্যমুত্তমংববন্ধ সুপ্তোরগভোগপিণ্ডিতম্ ।

ভিনদ্বি তাবদ্বি নৈতদাসনংন যামি যাবৎ কৃতকৃত্যতামিতি ॥

তারপর তিনি সুপ্ত সর্পের স্তম্ভীকৃত ফনার মত উত্তম অকম্পিত পর্যঙ্কসন রচনা করলেন । (এবং বললেন) পৃথিবীতে যতদিন না কৃতকৃত্যতা (সফলতা) প্রাপ্ত হই ততদিন এই আসন ভাঙব না ।<sup>১১</sup> গৌতমের এই মানসিক অবস্থা প্রসঙ্গে ‘ললিতবিস্তার’ গ্রন্থের ১৯ অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে—

‘ইহাসনে শুষাতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ংচ যাতু ।

অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং নৈবাসনাং কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥

এই আসনেই আমার শরীর শুষ্ক হইয়া যাক, ত্বক অস্থি মাংস প্রলয় প্রাপ্ত হউক, বহুকাল তপস্যায় দুর্লভ যে বোধি, তাহা না পাইয়া যেন আমার শরীর এই আসন হইতে চালিত না হয় ।<sup>১২</sup> প্রগাঢ় আত্মপ্রত্যয়ে গৌতম উচ্চারণ করলেন — ‘যদি পর্বতরাজ মেরু স্থানচ্যুত হয়, সমস্ত জগৎ শূন্যে মিশিয়া যায়, সমস্ত জ্যোতিষ্কও আকাশ হইতে ভূমিতে পতিত হয়, বিশ্বের সকল জীব একমত হয় এবং মহাসাগর শুকিয়ে যায়, তথাপি আমাকে এই ক্রমমূল হতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারিবে না ।’<sup>১৩</sup> ধ্যানে সমাধিস্থ হলেন তিনি । তাঁর ‘মার বিজয়কথা’ বহু বৌদ্ধ কাব্যগ্রন্থে চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে । মারবিজয়ী গৌতম এরপর ধ্যানে মগ্ন হয়ে একে একে চারটি স্তর অতিক্রম করেন । “রাত্রির প্রথম প্রহর শেষে তিনি ধ্যানের পূর্বা নিরামান স্মৃতির স্তর অতিক্রম করেন । এই স্তরে পূর্ব জন্মের স্মৃতি প্রতিফলিত হয় । রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের শেষে চুত্বোপস্টি স্তর অতিক্রম করেন । এই স্তরে তাঁর অন্তরে জীব জগতের জন্ম মৃত্যুর আদি রহস্য উদ্ঘাটিত হয় । রাত্রি তৃতীয় প্রহরে ধ্যানের তৃতীয় স্তর ‘আশ্রবক্ষয়’ — এই স্তরে তিনি হয়ে ওঠেন বন্ধনহীন মুক্ত পুরুষ । রাত্রি চতুর্থ প্রহরে পূর্ণজ্ঞান বা সম্যকজ্ঞান বা বোধিলাভ করে হয়ে

ওঠেন বুদ্ধ।<sup>৪৪</sup> এরপরও প্রসন্ন স্নিগ্ধ প্রশান্ত বুদ্ধদেব আরো কিছুদিন তপস্যালব্ধ পরমানন্দে তন্ময় হয়ে থাকেন। পরম নিশ্চিন্তে বুদ্ধদেব উচ্চারণ করেছিলেন এই উদাস্ত গান —

‘অনেকজাতিসংসারং সন্দাবিসৃসং অনিববিসং  
গহকারকং গবেসন্তো দুখ্কা জাতি পুনপ্পুনং।  
গহকারকং দিটেঠাহসি পুন গেহংন কাহসি,  
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্গা গহকুটং বিসম্বিতং  
বিসম্বারগতং চিস্তং তনহানং খয়মম্বাগা।

অনুবাদ — দেহরূপে গৃহনির্মাতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে কিন্তু তাহাকে না পাইয়া কতবার ভ্রমণ করিলাম; পুনঃপুন জন্মগ্রহণ দুঃখকর। হে গৃহকারক, এইবার তোমাকে দেখিয়াছি, আর গৃহনির্মাণ করিতে পারিব না, (সংসারবর্ষে আর প্রত্যাবর্তন করিব না।) তোমার সকল কষ্টদণ্ড ভগ্ন হইয়াছে, গৃহকুট (গৃহচূড়া কণিকামণ্ডল) নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নির্বাণগত (সংস্কার সমূহ হইতে মুক্ত) আমার চিন্তা সকল তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে।<sup>৪৫</sup> এরপর আলোকিত আনন্দমগ্ন তথাগত স্থির করেছিলেন — ‘যতদিন আমি ধর্ম ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে না পারি ততদিন পরিনির্বাণগত হইব না।’<sup>৪৬</sup> মহাপরিনির্বাণের পূর্বে নিরন্তর মানুষের কল্যাণে, মানুষের সন্তাকে জাগরিত করে তোলার জন্য শক্তি দিয়েছেন, উপদেশ দিয়েছেন, পথ দেখিয়েছেন তিনি।

## বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন

করুণাময় বুদ্ধদেব সর্বশ্রেষ্ঠ মানব।<sup>১৭</sup> বিশ্বের সমস্ত করুণা ঘনীভূত হয়ে যেন তাঁর প্রাণধারায় উৎসারিত। সেই করুণা ও আনন্দময় প্রেমের ধারা নিখিল প্রাণজগতে পরিপূর্ণরূপে পরিব্যপ্ত হয়েছে। তাঁর প্রেমবাণী মানব জগতে দুঃখ মুক্তির পথ দেখিয়েছে। তাঁর প্রচারিত সেই সত্য, জ্ঞান ও ধর্ম কথা পরবর্তীকালে সংকলিত হয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্যদের একনিষ্ঠতায়। প্রকাশিত হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্বের আকরগ্রন্থ — ত্রিপিটক। বিনয়পিটক, সূত্রপিটক, অভিধম্মপিটক — এই তিনটি পিটকের সমন্বয়ে ত্রিপিটক মহাগ্রন্থ। বৌদ্ধসংঘগুলি নিয়ন্ত্রণে নিয়মগুলি সংকলিত হয়েছে বিনয়পিটকে। বুদ্ধদেবের উপদেশগুলির সমাহার সূত্রপিটক এবং বৌদ্ধধর্মতত্ত্ব, দর্শন স্থান পেয়েছে অভিধম্ম পিটকে। এই অভিধম্ম পিটক বৌদ্ধ তত্ত্বশাস্ত্রের মহাসাগর।

বৌদ্ধধর্মের মূল দার্শনিক তত্ত্বগুলি হল —

চার আর্যসত্য

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

শীল মাহাত্ম

অনিত্য দর্শন

অনাত্মবাদ

প্রতীত্য সমুৎপাদবাদ

কর্মতত্ত্ব

জন্মান্তরবাদ  
বৌদ্ধ মৃত্যুভাবনা  
নির্বাণ

চার আৰ্যসত্য

সাধক গৌতম বোধিজ্ঞান লাভ করার পর কয়েকদিন পরমানন্দে মগ্ন থাকেন। তারপর অনুভব করেন তাঁর উপলব্ধ জ্ঞান জগৎ কল্যাণের নিমিত্তে, লোকসেবায় প্রচার করবেন। নিজে দুঃখ মুক্ত হয়ে সমস্ত মানব জাতীর দুঃখ মুক্তির ব্রত শুরু করেছিলেন বারানসীর ঋষিপত্তন-মৃগদাবে। সেখানে পাঁচ শিষ্যকে প্রথম উপদেশ দিয়েছিলেন চার আৰ্যসত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই চার আৰ্যসত্য বৌদ্ধ ধর্মদর্শনের মূলকথা।

এই চার আৰ্যসত্য —

দুঃখ আছে। জগৎ দুঃখময়।

দুঃখের হেতু আছে বা দুঃখের কারণ আছে।

দুঃখের নিবৃত্তি আছে বা দুঃখকে ধ্বংস করা যায় বা দুঃখ মুক্ত হওয়া যায়।

দুঃখের নিবৃত্তির উপায় আছে।

দুঃখ আছে

প্রাণ জগতে দুঃখ অনিবার্য, অবশ্যজ্ঞাবী। বুদ্ধদেব আট প্রকার দুঃখের কথা বলেছেন। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয় বিচ্ছেদ, ঈর্ষিতার অপ্রাপ্তি এবং পক্ষেপাদান স্কন্দময় এই দেহ ও মন দুঃখপূর্ণই। উল্লেখ্য যে, ধর্মচক্র প্রবর্তন করে বুদ্ধদেব এই আট প্রকার দুঃখের কথা বলেছিলেন। (যদিও অভিধম্ম পিটকে ব্যাধির কথা উল্লেখ নেই; বরং বলা হয়েছে — সোক পরিদেব-দুঃখ-দোমনস্ক-উপায়াসা দুঃখ)।

এই দুঃখকে দুইভাবে ভাগ করা হয় — শারীরিক দুঃখ ও মানসিক দুঃখ। জন্ম, জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু— শারীরিক দুঃখ। প্রিয় বিচ্ছেদ, অপ্রিয় সংযোগ, ঈঙ্গিতের অপ্রাপ্তি এবং পঞ্চস্কন্ধময় দেহমনের দুঃখকে মানসিক দুঃখ বলা হয়। দুঃখ দিয়ে এবং দুঃখ পেয়ে জন্মগ্রহণ করে শিশু। জন্মগ্রহণের পর যতদিন দেহ থাকে ততদিনই দুঃখ-বেদনা সঙ্গী হয়ে থাকে। দেহের বয়স যত বাড়ে; ততই জরা এসে দুঃখের ভার বাড়িয়ে দেয়। আর যতদিন দেহে প্রাণ থাকে, জগতের সুখ-হাসি-আনন্দের সঙ্গে নিরন্তর অপ্রিয় সংযোগ ও প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ উৎপন্ন করে। সেই সঙ্গে থাকে মানুষের প্রত্যাশা ও স্বপ্ন। এই স্বপ্নের পরিপূর্ণ সার্থকতা কোনো দিনই পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, প্রতিটি মানুষের মধ্যে কোনো না কোনো স্বপ্ন রয়েছে (তৃষ্ণা) এবং তা ক্রমবর্ধমান। মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী ধনতৃষ্ণা, জ্ঞানতৃষ্ণা, যশলোভ, অর্থলোভ — এই সবের কোনো না কোনোটির প্রতি প্রত্যাশা থাকেই। আর এই ঈঙ্গিতের অপ্রাপ্তিই দুঃখ দেয়। সর্বোপরি পঞ্চোপাদানস্কন্ধ বা নামরূপ-বিধৃত-সংসার (repeated existence) নিরবচ্ছিন্নভাবে দুঃখময়। দুঃখের হেতু বা কারণ আছে

মানুষ সবচেয়ে ভালোবাসে নিজেকে। তবে সংসারে পারস্পারিক ভালোবাসা ও আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত হয়। আর এসবের মূলে রয়েছে তৃষ্ণা (Selfish Desire)। এই তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ। তৃষ্ণার শেষ নেই; বরং বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিয়ে যায়। ফলে মানুষ (সন্তুগণ) জন্ম থেকে জন্মান্তরে পরিভ্রমণ করে। মানুষের সমস্ত কর্ম সম্পাদনের মূলেই রয়েছে এই তৃষ্ণা। তৃষ্ণা বিচিত্র রকমের, বিচিত্রভাবে। তবে একে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে — কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা।

কামতৃষ্ণা — মানুষের মন সব কিছু পাবার জন্য সুখের স্বপ্নে বিভোর থাকে। এই সাধারণ বিষয় বাসনাই হল কামতৃষ্ণা। এই তৃষ্ণার পরিণাম দুঃখ।

ভবতৃষ্ণা — প্রাপ্ত জীবনের অপ্রাপ্তির ইচ্ছেগুলি নির্মাণ করে আরও উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা থাকে মানুষের। এই প্রত্যাশা বা পুনর্জন্মের তৃষ্ণাই ভবতৃষ্ণা।

বিভবতৃষ্ণা — বহু মানুষ আছেন, যাঁরা জন্মান্তর বিশ্বাস করেন না। তাঁরা মনে করেন একটিই জন্ম, অতএব ভোগ করো, আনন্দ করো। বৌদ্ধ ধর্মমতে এঁদের উচ্ছেদবাদী বলা হয়েছে। এই উচ্ছেদবাদীদের তৃষ্ণাই বিভবতৃষ্ণা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, যাবতীয় দুঃখের কারণ মানুষের নিজের কর্ম। আর সমস্ত কর্মের মূলে রয়েছে তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণার কারণ অবিদ্যা। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি তত্ত্বে।

দুঃখের নিবৃত্তি আছে বা দুঃখ মুক্ত হওয়া যায়

বুদ্ধদেব উপদেশের প্রথম দিনেই বলেছিলেন — ‘হে ভিক্ষুগণ দুঃখ নিরোধের আর্যসত্য এই— এই তৃষ্ণার সম্পূর্ণ কামনাহীন নিরোধ, ইহার ত্যাগ, ইহার প্রতিবিসর্জন, ইহা হইতে মুক্তি এবং ইহার উচ্ছেদ হইলে দুঃখের নিরোধ হয়।’<sup>৪০</sup> বস্তুত দুঃখের কারণে যে তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটিত হলে তবেই দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে।

দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে

চতুর্থ আর্যসত্য দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। এই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় হল আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পালন। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ — সম্যক দৃষ্টি, সম্যক

সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি। এই মার্গ সমূহ তিনটি ভাগে বিভক্ত — শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা। শীলের অন্তর্গত সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক জীবিকা। সমাধির অন্তর্গত সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এই তিনটি মানসিক অনুশীলন। প্রজ্ঞার অন্তর্গত সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প। এই প্রজ্ঞাজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের আলোয় তৃষ্ণার মূলে যে অবিদ্যা — তা দূর হয়ে যায়। চিন্তা স্নিগ্ধ ও নির্মল হয়, চরিত্র পবিত্রতায় ভরে ওঠে, দুঃখ মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়ে ওঠে।

### অষ্টাঙ্গিক মার্গ

বৌদ্ধ দর্শনকে অনেকে তাত্ত্বিক নেতিবাচক দর্শন বলে মনে করেছেন। কিন্তু এই দর্শন প্রকৃতপক্ষে বিশ্বমানবতাবাদের কথা বলেছে, প্রেম ও মৈত্রীর আনন্দময় আত্মজাগরণের কথা বলেছে। এই ধর্মের মূল ভাব— ‘সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ মৈত্রী পোষণ করবে।’<sup>৪২</sup> আর এই বোধে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন অষ্টাঙ্গিক মার্গপালন। আর্য অষ্টাঙ্গিক সংমার্গের সাধনা দিয়েই ভবচক্রের অবিচ্ছিন্ন জীবন মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ হল — সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ প্রচেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি।

বুদ্ধদেব বলেছিলেন —

“মগ্গানট্টঙ্গিকো সেটেঠা, সচ্চানং চতুরো পদা,  
বিরাগো সেটেঠা ধম্মানং, দ্বিপদানঞ্চ চকমা।

এসো ব মগ্গো নহুহ এত্তো দস্সনস্স বিশুদ্বিয়া

এতমহি তু মে পটিপজ্জথ, মারস্সেতং পমোহনং।

মার্গ সকলের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ শ্রেষ্ঠ, সত্য সকলের মধ্যে চারি আর্য সত্য শ্রেষ্ঠ, ধর্মের মধ্যে বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ, মনুষ্য সকলের মধ্যে চক্ষুস্থান (বুদ্ধ) শ্রেষ্ঠ। হহাই একমাত্র পথ। দৃষ্টি বিশুদ্ধির নিমিত্তে (সম্যক দৃষ্টির) অন্য পথ নাই। তোমরা ইহাকে অবলম্বন করো। ইহা মারের প্রমোহনকারী।”<sup>১০</sup> এইভাবে বুদ্ধদেব অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন অষ্টাঙ্গিক মার্গকে।

### সম্যক দৃষ্টি

জগৎ সম্পর্কে অশ্রান্ত যথার্থ সত্য দর্শন বা জ্ঞানলাভই সম্যক দৃষ্টি। অবিদ্যায় আচ্ছন্ন মানুষ জীবজগৎ সম্বন্ধে ৬২ প্রকারের মিথ্যা দৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা (পালি দীর্ঘ নিকায়ে ব্রহ্মজাল সূত্রে ৬২ প্রকার মিথ্যা দৃষ্টির পরিচয় রয়েছে) পোষণ করে এবং সেগুলির মধ্যে আচ্ছন্ন থাকে। মরুভূমির মরীচিকার মত অনিত্যকে নিত্য মনে হয়, দুঃখকে সুখ মনে হয়, অবাস্তবকে বাস্তব মনে হয়। সম্যক দৃষ্টি বা বিশুদ্ধ দৃষ্টি এই সব অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে প্রকৃত সত্যদর্শন ঘটায়।

সম্যক দৃষ্টি দু’প্রকার — লৌকিক ও লোকোত্তর। আমি জন্ম জন্মান্তরে কর্মফল ভোগী সত্ত্ব ভিন্ন অন্য কিছু নহি — এই জ্ঞান সত্যানুলোমিক জ্ঞান (যে বস্তু যা, তাকে তেমনভাবে দেখা)। আর এই জ্ঞান-দৃষ্টি লৌকিক দৃষ্টি। লোকোত্তর মার্গ ও ফলযুক্ত যে জ্ঞান তাই লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি। আবার সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি তিন ধরনের — সাধারণ মানুষ বা পৃথগজন, শৈক্ষ্য এবং অশৈক্ষ্য ব্যক্তি। পৃথগজন ব্যক্তি দু’ধরনের — একদল কর্মফলে বিশ্বাসী হয়েও আত্মাকে স্বীকার করেন। একদল কর্মফল মেনে নিয়েছেন এবং শাস্ত্রত আত্মায় বিশ্বাস করেন না। শৈক্ষ্য ব্যক্তি সাত ধরনের। আবার অর্হন্তলাভ করেছেন যাঁরা তাঁদের বলা হয় অশৈক্ষ্য।



## সম্যক সংকল্প

বোধিজ্ঞান লাভের জন্য উত্তম সংকল্পের প্রয়োজন। বুদ্ধদেব আপ্তবাক্যে দৃঢ় হয়ে যখন বলেছিলেন —

‘ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু —

অপাপ্য বোধিং বহু কম্পদুর্লভাং নৈবাসনাং কায়মতশ্চলিষ্যতে ইতি ॥

এই আসনেই আমার শরীর শুষ্ক হইয়া যাক, ত্বক অস্থি মাংস প্রলয় প্রাপ্ত হউক, বহুকাল তপস্যায় ও দুর্লভ যে বোধি, তা না পাইয়া যেন আমার শরীর এই আসন হইতে চলিত না হয়।’

এই দৃঢ় প্রত্যয়ই প্রকৃত সংকল্প। আসলে সাধারণ মানুষ জাগতিক সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, অনিষ্ট চিন্তা, অকুশল চিন্তায় মগ্ন থাকে। এই সব কু-চিন্তা থেকে বেরিয়ে হৃদয়ে মৈত্রী করুণা সৎচিন্তা জাগ্রত করার সংকল্পকে সম্যক সংকল্প বলা হয়।

দুঃখ থেকে পরিত্রাণের জন্য তিনটি সংকল্পে দৃঢ় হতে হয় — নৈষ্করম্য সংকল্প (কাউকে দুঃখ না দেওয়া), অব্যাপদ সংকল্প (হিংসা না করা) এবং অবিহিংসা সংকল্প (কোনো কামনায় চিন্তকে কলুষিত না করা)। বস্তুত, সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প একত্রিত হলে প্রজ্ঞার উদয় হয়। তখন অবিদ্যার অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

## সম্যক বাক্য

সর্বদাই সত্যকথা বলা ও বাকসংযম করাই সম্যক বাক্য। এই মার্গ অনুযায়ী চার ধরনের বাক্য সংযম করতে হয়।

১. মৃষাবাদে বিরত হওয়া অর্থাৎ নিজের জন্য অথবা অন্যের জন্য সম্ভ্রানে মিথ্যা কথা না বলা।
২. পিশুন বা ভেদবাক্য থেকে বিরত থাকা। অর্থাৎ হিংসার বশে অন্যদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় এমন কোনো কথা না বলা। বরং এমন কথা বলা যায়, যার ফলে শত্রুত্রাও পরস্পর মিত্রে পরিণত হয়।
৩. পরুষ বা কর্কশ বাক্য না বলা। স্নিগ্ধ, শ্রুতিমধুর, কল্যাণময়, জনমুগ্ধ বাক্য ব্যবহার করা।
৪. প্রলাপ বা অতিকথা অথবা বৃথা কথা না বলা। অপ্রয়োজনীয় অর্থহীন ও অন্যের বেদনা দেয় — এমন বাক্য থেকে বিরতি থাকা। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলেছেন —

সচ্চং ভনে, ন কুঙ্খোয্য দঙ্জাঙ্গস্মিস্পি যচিতো,  
এতোহি তীহি ঠানেহি গচ্ছে দেবান সন্তিকে।।

সত্য কথা বলিবে, ক্রোধ করিবে না, প্রথিত হইলে অঙ্গ পদার্থও দান করিবে। এই তিনটি উপায় দ্বারা দেবতাগণের নিকট গমন করিবে।<sup>৭২</sup>

সম্যক কর্মাস্তু

শুদ্ধ ও পবিত্র কর্মই সম্যক কর্মাস্তু। এই আর্থ্য মাগটি চার প্রকার কায়িক সংযম পালনের নির্দেশ দিয়েছে।

- প্রাণিহত্যা না করা এবং প্রতিটি প্রাণের প্রতি দয়াপরায়ন হওয়া।
- চুরি থেকে বিরত থাকা এবং সাধ্যমত দান করা।
- ‘কাম’ বিষয়ে মিথ্যাচার না করা এবং অন্য নারীর প্রতি কামনা পরায়ন না হওয়া।

- সকল প্রকার নেশাদ্রব্য অর্থাৎ মদ, গাঁজা, ভাঙ, আফিম ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা।

এক কথায় বৌদ্ধধর্মের ‘শীল’ পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই মার্গে।

### সম্যক জীবিকা

এই মার্গ মতে সৎ, নির্দোষ জীবিকাই সম্যক জীবিকা। এমন জীবিকা পালন করতে হবে, যেন কোনো প্রাণির অনিষ্ট না হয়।

### সম্যক প্রচেষ্টা বা সাধনা

আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সাধকের সৎ মানসিক ইচ্ছাই সম্যক প্রচেষ্টা। এই মার্গে সাধকের চারটি সত্য পালন করতে হয়—

- হৃদয়ে কোনোভাবে অকুশলন ও কুচিন্তার উদয় না হয়, তার জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তি নিয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া।
- যদি কোনো অকুশল বা মন্দ চিন্তার উদয় হয়, তাহলে প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তাকে বিনষ্ট করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া।
- হৃদয়ে সদাসর্বদা কুশল চিন্তা বা সুচিন্তার উদয় ঘটানোর জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া।
- অন্তরের মধ্যে সুচিন্তার উদয় ঘটলে, তাকে স্থায়ী করা এবং বৃদ্ধি করার জন্য স্থির করার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়া।

এইভাবে হৃদয়ে সৎ চিন্তার সমৃদ্ধির সৌরভে সাধক সমস্ত মানসিক দুর্বলতা দূর করতে পারেন।

## সম্যক স্মৃতি

দেহ ও মনের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ স্মৃতিতে জাগিয়ে রাখাই সম্যক স্মৃতি। তবে সাধকের সততই ভালো-মন্দ, হিত-অহিত, করণীয় ধর্ম-অধর্মকে স্মৃতি দিয়ে বিবেচনা করে শুভ বা হিত ধর্ম পালন করতে হয়। সম্যক স্মৃতি থাকলে তবে সাধকের কায়ানুদর্শন, বেদানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন ও ধর্মানুদর্শন ঘটে।

কায়ানুদর্শনে সচেতন বীর্যবান সাধক ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ — চারটি মহাভূতের সংমিশ্রনে সুগঠিত দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ দেখতে পান, উপলব্ধি করেন। এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাসের গমনাগমনও অনুভব করেন। নশ্বর দেহের বেদনাদি দুঃখ দেখে দেহের প্রতি অনাসক্ত হয়ে ওঠেন।

সমস্ত দুঃখের মূল—বেদনা সমূহ। আসক্তি ও সুখ আনন্দময় ও সুখময়। কিন্তু তার পরিণামে দুঃখ অনিবার্য। তাই সাধক বেদনাদির প্রতি বীতরাগ হয়ে ওঠেন। তখন তাঁর বেদনাদর্শন ঘটে।

সাধক চিন্তে রাগ, অনুরাগ, মোহ, দ্বেষ উৎপন্ন হয়। তখন সাধকের বীর্যবান সচেতন স্মৃতি সংভাব জাগ্রত করে। ফলে সাধকের চিত্তানুদর্শন ঘটে।

সম্যক স্মৃতি ধর্মানুদর্শন ঘটায়। তখন সাধকের অনিত্য, অনাস্ব্য সম্পর্কে ধারণা হয় এবং পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তি ও বিলয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ ঘটে।

সম্যক সমাধি : আর্থ অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রথম সাতটির মধ্যে দিয়ে চিন্ত বা মন যে একাগ্রতায় পৌঁছায়— তাহাই সম্যক সমাধি। সমাধি ধ্যানভেদে চার প্রকার —

- কামনা, বিদ্বেষ, আলস্য, অশান্ত চিন্তা, দ্বিধা ও সংশয় ত্যাগ করে সাধক প্রীতিময় সুখে প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হন।
- সাধকের অন্তর বিচার ও বিতর্ক না করে আনন্দময় চিন্তে একাগ্র হয়ে দ্বিতীয় ধ্যানে মগ্ন হন।
- দেহ-সুখ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে আনন্দময় চিন্তে একাগ্র হয়ে তৃতীয় ধ্যানে মগ্ন হন সাধক।
- চতুর্থ ধ্যানে সমাহিত সাধক দেহের সুখ-দুঃখ এবং মনের সুখ-দুঃখ পরিহার করে পরিশুদ্ধভাবে মগ্ন হন।

এইভাবে সম্যক সমাধিপ্ৰাপ্ত হন সাধক। এই সম্যক সমাধির নামই ‘ব্রহ্মবিহার’। ‘অপরিমিতর মানসকে প্রীতিভাবে, মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে।’<sup>৫০</sup> সম্যক সমাধির চারটি অবস্থা — মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা।

মৈত্রী — বিশ্বমাঝে আপন সত্তাকে ব্যাপ্ত করার নামই মেস্তিভাবন বা মৈত্রী ভাবনা। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ সুখী হোক, অহিংসা ব্রত গ্রহণ করে সমস্ত প্রাণির প্রতি কল্যাণ চিন্তায় ও প্রেমে আত্মনিবেদিত হোক — এই ভাবনাই মৈত্রী ভাবনা। মৈত্রীভাবনাই সাধককে ধ্যানে সমাহিত করে।

করুণা — মৈত্রী থেকে আসে করুণা। সাধকের অন্তরে জীবজগতের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত করার প্রেরণাশক্তি জাগরিত হয়। এই অবস্থাই করুণা।

মুদিতা — সাধক যখন আপন স্বার্থ সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে অন্যদের সুখে-আনন্দে পরম তৃপ্তিলাভ করেন তখন তাঁর মধ্যে মুদিতাভাব জেগে ওঠে।

উপেক্ষা — মৈত্রী-করুণা ও মুদিতা-সাধক এই তিনটি অবস্থা অতিক্রম করে উপেক্ষাভাবে উপনীত হন। এই অবস্থায় সাধক ‘তৃষ্ণায় আকর্ষণ অতিক্রম করে পরমপ্রাপ্তি ও পরমানন্দ লাভ করেন।’

প্রসঙ্গত, উল্লেখ করতে হয় যে, অষ্টাঙ্গিক মার্গকে তিনভাগে ভাগ করা হয় — শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা। সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মাস্ত ও সম্যক জীবিকা — শীলের অন্তর্গত। সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি — সমাধির অন্তর্ভুক্ত। আর প্রজ্ঞার মধ্যে রয়েছে সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প। এই শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা তিনের সমন্বয়ে নির্মল সাধকচিন্তে জ্ঞানের আলো প্রদীপ্ত হয়।

## শীল মাহাত্ম্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘ব্রহ্মবিহার’ প্রবন্ধে লিখেছেন — ‘তিনি (বুদ্ধদেব) বলেছেন — শীল গ্রহণ করাই মুক্তিপথের পাথেয় গ্রহণ করা। চরিত্র শব্দের অর্থই এই যাতে করে চলা যায়। শীলের দ্বারা সেই চরিত্র গড়ে ওঠে। শীল আমাদের চলবার সম্বল।<sup>১৪</sup> এই শীল পালনে মঙ্গল সম্ভব। আর মঙ্গললাভই প্রেম ও মুক্তিলাভের সোপান। শীল পালনের মধ্যে দিয়ে মানুষ কায়িক মানসিক ও নৈতিক বিধি বিধানের মাধ্যমে নিজেকে পরম লক্ষ্যের অর্থাৎ নির্বাণের উপযুক্ত করে তোলেন। বৌদ্ধধর্মে বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্ন শীল পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে বৌদ্ধশাস্ত্রে ‘পঞ্চশীল’, ‘অষ্টশীল’ বা ‘দশশীল’ তত্ত্বের বিধান রয়েছে। অবশ্য পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণদের জন্য বৌদ্ধ বিহারগুলিতে ২২৭টি শীলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই শীল পালনের মধ্য দিয়ে অন্তরলোকে চেতনার জাগরণ ঘটে।

সুগত বুদ্ধদেব শিষ্যদের প্রথম ‘পঞ্চশীল’ পালনের কথা বলেছিলেন।

এই পঞ্চশীল হল —

- সমস্ত জীব জগতের প্রতি সম্পূর্ণরূপে হিংসা ত্যাগ করতে হবে।
- পরদ্রব্যের প্রতি লোভ না করা এবং চুরি না করা।
- মিথ্যা কথা না বলা।
- সংযম পালন করা। বিশেষ করে কামনা ও নেশার প্রতি চিত্ত সংযম করা।
- কোনো মানুষের প্রতি ঈর্ষা বা দ্বেষ পোষণ না করা।

‘অষ্টশীল’ বিধিতে যুক্ত হয়েছে আরও তিনটি শীল —

- অসময়ে বা দুপুরের পর খাদ্যগ্রহণ করতে পারবে না।
- সকল প্রকার বিলাসিতা থেকে বিরত থাকতে হবে অর্থাৎ নাচ, গান, অভিনয়, অলংকার ব্যবহার, অঙ্গরাগ, সুগন্ধি তেল ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।
- গুণীজনকে সম্মান, সেবা ও সঙ্গলাভ করতে হবে।

যে সমস্ত শ্রমণ বা সংঘবাসী ‘অষ্টশীল’ পালন করতে সমর্থ হবেন তাঁদের আরও দুটি কঠোর শীল পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব।

- শক্ত বিছানায় শয়ন করতে হবে।
- জীবনযাপনে সমস্ত আরাম থেকে বিরত হয়ে কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করতে হবে।

সংঘবাসী বৌদ্ধসাধকদের জন্য এই দশটি শীল যথাযথভাবে পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে সংঘে নারীর প্রবেশ ঘটেছে, সংঘের

সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সংঘবাসী শ্রমণদের সংখ্যা বেড়েছে। ফলে নিত্যনতুন সমস্যা ও সংকট দেখা দিয়েছিল। আর সেই সংকটের সমাধানের জন্য নতুন নতুন শীল সংযোজন করা হয়েছিল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত ২২৭টি শীলের বিধান দেওয়া হয়েছিল।

প্রতীত্য সমুৎপাদনীতি তত্ত্ব

বৌদ্ধ দর্শনে ‘প্রতীত্যসমুৎপাদনীতির সহজ অর্থ — বৌদ্ধ কার্যকারণ নীতি। এই নীতি নিয়ে দেশে এবং বিদেশে বিস্তার ও জটিল বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা হয়েছে। বস্তুত, ‘জন্মতত্ত্ব ও জীবন প্রবাহ’ আলোচিত হয়েছে প্রতীত সমুৎপাদবাদ নীতি অনুযায়ী।

বৌদ্ধদর্শন মতে, অনিত্য অন্তসারশূন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহমান অনুভূতিগুলিকে নিত্য ও শাস্ত্র মনে করা এবং দুঃখকে সুখ; অসারকে সার মনে করার নামই অবিদ্যা। অবিদ্যাই জন্ম-জন্মান্তর চক্রের সন্ধিস্থল। অবিদ্যার নিহিত কারণ লোভ দ্বেষ ও মোহ। আবার এই অবিদ্যাই ‘সংস্কার’-এর কারণ। সংস্কার হল — পুনর্জন্ম উৎপাদনকারী কর্ম বা পূর্বজন্মের কৃতকর্ম। এই ‘সংস্কার’ ‘বিজ্ঞান’-এর কারণ। ‘কর্ম’ — কারণরূপে (পূর্বজন্মের ফল স্বরূপ মাতৃগর্ভে অবস্থান) অতীতের সংস্কার মাতৃগর্ভে চেতনাশীল সত্তার উৎপত্তি করে। এই অবস্থাই ‘বিজ্ঞান’ (Rebirth Consciousness)। উল্লেখ্য যে, ‘মহানিদান সূত্রে’ বলা হয়েছে — ‘একবার সমুদয় অবিদ্যা ও উৎপাদন নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে কুশল বা অকুশল আর কোন প্রকার সংস্কার সংস্কৃত হইবে না, সুতরাং পুনর্জন্মজনক কোন বিজ্ঞানই মাতৃজ্ঞান মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হয় না।’<sup>৫৫</sup> এই ‘বিজ্ঞান’ — নামরূপের (Mental and Physical Phenomena) কারণ। বেদনা (feeling) সংজ্ঞা (Perception), স্পর্শ (impression), চেতনা (Volition) জীবিতেন্দ্রিয় (mental Vitality),



একাগ্রতা ও মনোনিবেশ — এই চৈতসিক ধর্মগুলির নাম — ‘নামস্কন্ধ’। নামরূপের কারণে ষড়ায়তনের উৎপত্তি। এই ষড়ায়তন (mental life) হল চক্ষুরায়তন, শ্রোত্রায়তন, জিহ্বায়তন, কায়াতন এবং মনায়তন। এই স্তরে জীবের ইন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল হয়। ষড়ায়তনের কারণে ‘স্পর্শের’ (Sensory and mental impression) উৎপত্তি। এই স্তরে ইন্দ্রিয়গুলি বস্তুর সঙ্গে সংস্পর্শ অনুভব করে। চোখ দিয়ে চাক্ষুষ সংস্পর্শ, কান দিয়ে শব্দ সংস্পর্শ, নাক দিয়ে গন্ধ সংস্পর্শ, জিহ্বা দিয়ে আস্বাদ সংস্পর্শ, ত্বক দিয়ে দেহসংস্পর্শ এবং মন দিয়ে মানসিক সংস্পর্শ ঘটে।

আবার এই ‘স্পর্শ’, ‘বেদনা’-র (feeling) কারণ। এই স্তরে জীবের দুঃখ শুরু হয়। তখন প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের স্পর্শজাত বেদনা অনুভূত হয়। এই বেদনা ‘সুখবেদনা’ হতে পারে আবার দুঃখ বেদনা হতে পারে। এই বেদনার ভিতর দিয়ে ‘তৃষ্ণার’ (craving) উৎপত্তি। এই তৃষ্ণা ছয় প্রকার — রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা। আবার এই ছয়প্রকার তৃষ্ণার যে কোনো একটি বা একাধিক অবলম্বনে যদি ভোগ-লালসা জন্মায় তাহলে তাকে বলে কামতৃষ্ণা। যদি শাস্ত্রত দৃষ্টি বা নিত্য-সত্য সনাতন অস্তিত্বের সম্বন্ধ বিশিষ্ট হয় তাহলে ‘ভব তৃষ্ণা’ এবং যদি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে— এই বিশ্বাস তৈরি হয় তাহলে ‘বিভবতৃষ্ণা’।

‘তৃষ্ণা’-র ভিতর দিয়ে উপাদানের উৎপত্তি বা তৃষ্ণাই উপাদানেরই (clinging) কারণ। আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয় এই স্তরেই। উপাদান চার প্রকার — কামোপাদান, দৃষ্ট্যুপাদান, শীলব্রতোপাদান, আত্মবাদোপাদান। এই ‘উপাদান’, ‘ভব’-এর (Life process) কারণ। ‘ভব’-দুই প্রকার—কর্মভব ও উৎপত্তিভব। কর্মভবই সংস্কার বা পূর্নজন্ম উৎপাদনকারী কর্ম এবং উৎপত্তিভব হল — কর্মের ফল স্বরূপ পূর্নজন্ম প্রক্রিয়া। এই স্তরগুলির

মধ্যে জন্ম-মৃত্যু আবর্তিত হয়ে চলেছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই নীতি ‘প্রতীত্য সমুৎপাদবাদ’ নীতি।

অনিত্য দর্শন

বৌদ্ধধর্মে অনিত্য দর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দর্শন। বুদ্ধদেব মনে করতেন, মন নিরপেক্ষ কোনো সত্তা নেই। জগতে সমস্ত কিছুই সতত পরিবর্তনশীল। এই বৈচিত্র্যময় বস্তু বিশ্ব মানুষের চেতনার অনুভূতিমাত্র। মন ও চৈতন্যময় দেহের মধ্যেই বস্তু বিশ্বের বিকাশ বিবর্তন ও বিনাশ সংঘটিত হয়। প্রতিদিন সূর্য থেকে যে আলো উৎসারিত হয় — তা নতুন ও অনিত্য। এক নদীর জলে যেমন দু’বার অবগাহন করা যায় না, তেমনি আমরা যাকে বিশ্বজগৎ বলি, তাও নিত্য বা স্থায়ী নয়। যে সমস্ত ধর্মদর্শন মন নিরপেক্ষ স্থায়ী বিশ্ব ও অবিনশ্বর আত্মা বিশ্বাস করে — তাদের ধারণা যথার্থ নয়। পঞ্চস্কন্ধময় মানবজীবন অনিত্য, অধ্রুব। বুদ্ধদেব তাই বলেছেন —

সব্বে সঙ্খরা অনিচ্ছাতি যদা পঞ্ণয় পস্সতি  
অথ নিববিন্দতি দুক্কে, এস মম্মো বিশুদ্ধিয়া।

অর্থাৎ ‘সকল সংস্কার (পঞ্চস্কন্ধ) অনিত্য, ইহা যখন লোকে প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করেন, তখন তিনি সর্ব দুঃখে (স্কন্ধধারণরূপ দুঃখে) নির্বেদ প্রাপ্ত হন ইহাই বিশুদ্ধ মার্গ।’<sup>১৬</sup> এমনকি কোনো মুহূর্তই স্থায়ী নয়, নিত্য নয়। প্রকৃতির নিয়মে সবকিছুই পরিবর্তনশীল। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা যা কিছু দেখি, উপলব্ধি করি, যা কিছুর সংস্পর্শে আসি, সেই জড় ও চেতন — তার কোনো কিছুই স্থায়ী নয়, নিত্য নয়; অনিত্যমাত্র। এমনকি আমরাও কেউ-ই স্থায়ী নই। যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যু এসে পঞ্চস্কন্ধময় পরিবর্তনশীল দেহকে হরণ করতে পারে। তাই জীবনের উপাস্ত্রে এসে বুদ্ধদেব প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বলেছিলেন — ‘সত্যের আশ্রয় গ্রহণ কর — আপনা ভিন্ন অন্য

কাহারো উপর নির্ভর করিও না। আমি চলিয়া যাইতেছি দেখিয়া শোক করিও না। আমার জীবন, ধর্ম ও সংঘ এই যাহা রাখিয়া যাইতেছি, তাহা অক্ষয় ও অবিনাশী। ... আমার উপদেশ মনে রেখো, যাহার জন্ম তাহার মৃত্যু, যার বৃদ্ধি তারই ক্ষয়; সংসারে সকলই ক্ষয়শীল, সকলই অনিত্য। ইহা জানিয়া যত্নপূর্বক তোমরা নিজ নিজ মুক্তি সাধন কর।<sup>৭৭</sup> জগৎ সংসারের এই প্রবাহ কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত। তবে কোন কারণও শাস্ত্রত বা নিত্য নয়; নিয়মে আবদ্ধ। ‘যং ভূতং তং নিরোধধম্মং — যা কিচ্ছুর উৎপত্তি হয়েছে বা জন্ম হয়েছে তার বিনাশ আছেই। সমস্তই অপ্রব, ক্ষণস্থায়ী। কেবলমাত্র প্রাণভেদে স্থায়িত্বের তারতম্য ঘটে।

### অনাত্ম দর্শন

ভারতীয় হিন্দু ধর্মদর্শনে শাস্ত্রত অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে উপনিষদগুলিতে ও গীতায় আত্মাকে নিত্য, সনাতন, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য বলা হয়েছে। ‘কাঠকোপনিষৎ’-এ আত্মা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে —

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা এবং রূপং বহুধা যঃ করোতি

তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরান্তেষাং সুখং শাস্ত্রতন্ত্রেতরেষাম।<sup>৭৮</sup>

অর্থাৎ আত্মা পরমেশ্বর, সর্বগত, স্বতন্ত্র, এক, অদ্বিতীয়। ইহার তুল্য কোন বস্তু নাই। এই অনন্ত জগৎ ইহার বশঙ্গত। ইতি সর্বভূতের ইহীয়া স্বকীয় সৎ একরস, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান স্বরূপকে নামরূপাদি অশুদ্ধ উপাধিভেদে বহু আকারে প্রকাশিত করিতেছেন। যে ধীর ব্যক্তি দেহস্থ এই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তিনি নিত্য আনন্দের অধিকারী হন।<sup>৭৯</sup> ‘মুণ্ডকোপোনিষৎ’-এ জ্যোতির্ময় শুদ্ধ আত্মার উল্লেখ আছে। নির্মল চিন্তা যতিগণ সম্যকজ্ঞান ও নিত্য ব্রহ্মার্চ্য দ্বারা উপলব্ধি করতে পারেন—

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মাচর্যেন নিত্যম্।  
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুদ্রো যংপশ্যতি যতয়ঃ ক্ষীণদোষা।।<sup>১০</sup>

আত্মা শাস্বত, অপরিবর্তনীয়, বিমৃত্যু, শোকহীন, নিত্য সংকল্পযুক্ত। আত্মা  
নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধ নিরোগ। গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে —

‘অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যেয়ামক্রেদ্যোহশোষ্য এব চ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুরচলোহয়ং সনাতন।।<sup>১১</sup>

এই অপরোক্ষ আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্রেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বব্যাপী,  
স্থির, অচল এবং সনাতন। এই আত্মা জন্ম-মৃত্যু রহিত অপক্ষয়হীন এবং  
বৃদ্ধিশূন্য। মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র পরিধান  
করেন, আত্মা ও সেইরূপ নতুন শরীর গ্রহণ করেন —

বাসাংসি জীর্নানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা

ন্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহী।<sup>১২</sup>

অতএব আত্মা অবিনাশী নিত্য, অজ, অব্যয়, অচিন্ত্যনীয়, ইন্দ্রিয়াতীত।  
আত্মা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম, বৃহৎ থেকে বৃহত্তম।

জৈনধর্মেও আত্মাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ভগবতী সূত্রে  
মহাবীর বলেছেন— দেহ এবং আত্মা একও বটে এবং পৃথকও বটে।  
(১৩-৭-৪৯৫)

বৌদ্ধধর্মে ও বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থগুলিতে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা  
হয়নি। বুদ্ধদেব বলেছেন—

সব্বে ধম্মা অনজ্জাতি যদা পঞ্চায় পম্মতি

অথ নিব্বিন্দতি দুস্কে, এস মম্মো বিশুদ্ধিয়া।

সকল ধর্ম (পদার্থই) অনাত্ম, ইহা যখন মনুষ্য সম্যক জ্ঞানের সহিত দর্শন করেন, তখন তিনি সর্বদুঃখে নির্বেদ প্রাপ্ত হয়; ইহাই বিশুদ্ধ লাভের উপায়।<sup>১০</sup> বৌদ্ধমতে জীবাত্তা বলিয়া দেহ ইহাতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নেই। জন্ম সংস্কারে জীবনশ্রোত বহিয়া যাইতেছে। তাহার মধ্যে ‘আমি’ ‘তুমি’ কোনো মূল সত্তা বিদ্যমান নাই।<sup>১১</sup> বৌদ্ধ সাধকদের পরমপ্রার্থিত ‘নির্বাণ’ অবস্থা উপলব্ধি করার জন্য চারটি আর্য়সত্যজ্ঞান লাভের সঙ্গে ‘জাগতিক ধর্ম সমূহ অনাত্ম’— এই জ্ঞানলাভ অপরিহার্য। ‘তাহ’ চারি আর্য় সত্যের দেশনা এবং অনাত্ম দেশনাকে বুদ্ধগণের সর্বোৎকৃষ্ট দেশনা (বুদ্ধানং সমুৎকৃৎসিকা ধম্মদেমনা) বলা হইয়াছে।<sup>১২</sup> বুদ্ধদেব নিজেই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুকদের নিকট ‘অনাত্মলক্ষণসূত্র’- দেশনায় বলেছেন শাস্ত্রত আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। কারণ এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নেই। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান - এই পঞ্চস্কন্ধ দিয়ে জীবদেহ গঠিত হয়। যেহেতু প্রতিটি স্কন্ধ নিয়ত পরিবর্তনশীল, অতএব দেহও পরিবর্তনশীল। এই দেহ অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। বৌদ্ধ সাধক জ্ঞানতিলক বলেছেন —

The Anatta doctrine teaches that neither within the bodily and mental Phenomena of existence, nor outside of them, can be found anything that in the ultimate sense could be regarded as a self existing real Ego-entity, soul or any other obiding substance. This is the central doctrine of Buddhism without understanding of which a real knowledge of Buddhism is altogether impossible. It is the only really specific Buddhist doctrine with, which the entire structure of the Buddhist teaching stands or falls. All the remaining Buddhist doctrines may, more or less, be found in other philosophic systems and religious, but the Anatta Doctrine has been chearly and unreservedly taught only by the

Buddha, wherefore the Buddha is known as the Anatta-Vadi, or teacher of Impersonality.”

অবশ্য বুদ্ধদেব এও স্বীকার করেননি যে মৃত্যুতে সব শেষ। আর এরই সূত্র ধরে ক্ষণ ভঙ্গুরবাদ ও জন্মান্তরবাদের প্রসঙ্গ এসেছে। বৌদ্ধধর্মমতে আত্মার অস্তিত্ব নেই কিন্তু জন্মান্তর সম্ভব। ‘নামরূপের আবির্ভাব পূর্বজন্মের কারণ সঞ্চাত। জীবন প্রবাহ যেমন ক্ষণভঙ্গুর অস্তিত্ব ব্যতিরেকেও এক চিন্তক্ষণ হইতে অন্য চিন্তক্ষণে চলিতে পারে, সেইরূপ বহুজীবন প্রবাহ ও অমর আত্মার সংক্রমণ ব্যতীত এক অস্তিত্ব হইতে অন্য অস্তিত্বে সংক্রমিত হইতে পারে। গঙ্গা বলিয়া পারমার্থিক দৃষ্টিতে কিছুই নাই, আছে গঙ্গাপ্রবাহ যাহা প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। অনাদি অতীত হইতে এই গঙ্গাপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতে চলিতে থাকিবে। তথাপি আমরা ব্যবহারিক ভাষায় বলিয়া থাকি, আমি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করি। ঠিক তদ্রূপ আমরা ভ্রম বশত বলিয়া থাকি আত্মাই জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে। শাস্বত গঙ্গা বলিয়া যেমন কিছুই নাই শাস্বত আত্মা বলিয়াও কিছুই নাই।” বৌদ্ধ দর্শন অনুযায়ী প্রতিমুহূর্তেই জীবের জন্ম মৃত্যু সংঘটিত হয়। মানুষের মনেও নিমেষের মধ্যে এক একটি চিন্তক্ষণ উপস্থিত হয়। এই চিন্তক্ষণ বা চিন্তাসন্নতির তিনটি অবস্থা — উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ। ক্ষণ বা নিমেষকাল সময়ের মধ্যে এক একটা চিন্তক্ষণ এই তিনটি অবস্থার মধ্যে দিয়ে বহুবার পরিবর্তন হয়। ফলে নিরন্তর পরিবর্তনশীল জীবনধারায় প্রতিটি ‘ক্ষণিকচিন্তা’ অতীত হওয়ার সময়ই তার সমস্ত চূড়ান্তশক্তি পরবর্তী চিন্তক্ষণ বা চিন্তাকে প্রদান করে। এইভাবে সতত গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল ‘চিন্তাসত্ত্বতি’ প্রবাহিত হয়। এত দ্রুত এই ঘটনা সম্পন্ন হয় যে, বোঝা যায় না। পৃথিবীর আনন্দগতি ও বার্ষিকগতিকে যেমন সহজবুদ্ধিতে (বিজ্ঞান জ্ঞান নয়) বুঝতে পারে না; এও তেমনই। অনাস্ব দর্শন মতে, প্রতি মুহূর্তে

জীবের জন্ম-মৃত্যু ঘটছে। এক একটি চিস্তের উৎপত্তিক্ষণে চিস্তের জন্ম এবং ভঙ্গক্ষণে (ধ্বংস) পুনর্জন্ম। কিন্তু এর গতি এত তীব্র যে, পরিবর্তনশীল এই চিস্তের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। আর এই পরিবর্তনশীল চিস্তাসত্ত্বটির ‘তৃষ্ণা’ পুনর্জন্ম ঘটায়। পুনর্জন্মের কারণ এই তৃষ্ণা। অতএব বৌদ্ধ দর্শনমতে আত্মার অস্তিত্ব নেই।

বস্তুত, ভারতীয় জনমানসে অনাত্মবাদ ও ক্ষণভঙ্গুরতত্ত্ব সেইভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। ভারতীয় বিশ্বাসে আত্মার অবিনশ্বরতা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত আছে।

কর্মতত্ত্ব

বৌদ্ধধর্মতত্ত্ব মতে জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয় পাঁচটি নিয়মের দ্বারা — ঋতু নিয়ম, কর্মনিয়ম, বীজনিয়ম, চিস্তানিয়ম এবং ধর্মনিয়ম। অবশ্য মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তত্ত্ব — কর্মতত্ত্ব। এই কর্মের উৎস ‘মন’ থেকে। কায়কর্ম ও বাক্কর্ম — সমস্তই নিয়ন্ত্রিত হয় মনের দ্বারা। বুদ্ধদেব বলেছেন —

‘মনোপূর্ব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়।

মনসাচে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা,

ততো নং সুখমস্বেতি ছায়া ব অনপায়িনী।

মনই ধর্মসমূহের পূর্বগামী, মনই ধর্মমধ্যে প্রধান পদার্থ এবং ধর্ম মন হইতে। উৎপন্ন হইয়াছে। যদি কেহ নির্মলাস্তকরণে কার্য্য করেন বা কথা কহেন, তবে সুখ তাহাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে।<sup>৩৭</sup> তিনি মানবজীবনে কর্মের উপর সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পুণ্যকর্মে বা সুকর্মে মঙ্গল ও আনন্দলাভ হয় কিন্তু পাপ কর্ম দুঃখময়। ধম্মপদে উচ্চারিত হয়েছে —

ন অন্তলিক্খে ন সমুদ্র মল্লো ন পব্বতাং বিবরং পরিস্ম,  
ন বিজ্জতী সো জগতি প্লদেসো যত্টিট্ঠতো মুল্লেক্ক্য পাপকর্মা।

অন্তরীক্ষে সমুদ্রমধ্যে কিংবা পর্বত বিবরে জগতে এমন কোনো স্থান বর্তমান নাই, যেখানে অবস্থান করিলে পাপকর্মের ফল হইতে মুক্ত হওয়া যায়।<sup>১৯</sup> এই কর্মই জন্ম মৃত্যু সামাজিক অবস্থান নির্মাণ করে দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন এই প্রসঙ্গে — ‘আমাদের বিশ্বাস এই যে, এই ধর্মে আর সমস্ত অঙ্গই আছে, কেবল ইহার মধ্যে ঈশ্বরের কোনো স্থান নাই। জ্ঞানে ইহার ভিত্তি এবং কর্মে ইহার মন্দিরটি গড়া।’<sup>২০</sup> ‘মধ্যমণিকায়সূত্রে’ (সূত্রসংখ্যা-১৩৫) বারানসীর শ্রেষ্ঠীকুমার বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করেছিলেন, মানুষের মধ্যে এত বিচিত্র রকমের বৈষম্যের কারণ কি? উত্তরে বুদ্ধদেব বলেছিলেন, ‘কর্মই’ এর প্রধান কারণ। কর্মগুণেই জীবের অবস্থান ও পরিণতি। মানুষ কর্মেরই উত্তরাধিকারী। মানুষ কর্মফলই ভোগ করেন। কর্মই মানুষকে ভাল-মন্দ অবস্থানকে চিহ্নিত করে দেয়। কু-কর্মের কুফল অবশ্যম্ভাবী। বুদ্ধদেব-শুভমানব কাহিনির মধ্যে এই সত্য প্রতিফলিত হয়েছে — মানুষ যেন প্রতি মুহূর্তে শুভ চিন্তা ও কল্যাণকর কর্মে ব্যাপ্ত থাকেন। তাহলে বৃহত্তর সমাজের মঙ্গল সাধিত হবে। উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধধর্ম দর্শনে ‘কর্ম’ বলতে শুধুমাত্র অতীতের কর্মকে বোঝানো হয়নি বরং ত্রিকাল চেতনার অনুষঙ্গ এসেছে। যে কোনো জীবনে অতীত কর্ম বর্তমানকে নিয়ন্ত্রণ করে, বর্তমান কর্ম ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করে। ভবিষ্যৎ যখন বর্তমান হবে, তখন তা এখনকার বর্তমানেরই কৃতকর্মের ফল বুঝতে হবে। তবে আরও তারতম্য আছে। কারণ বর্তমানের সাধু ব্যক্তি কার্যকারণসূত্রে ভবিষ্যতে অসাধু হবে না — এমনটি বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন — ‘আমরাই নিজেদের চিন্তা কর্ম দ্বারা আমাদের চরিত্র নির্ধারণ করি। সুতরাং আমরা আমাদের নিজেদের দুঃখ দুর্দশার জন্য ঈশ্বর কিংবা শয়তানকে দোষ



দিতে পারি না — সেজন্য আমরা নিজেরাই দায়ী; কারণ আমরা যার উপযুক্ত হয়েছি, এখন আমরা তা পেয়েছি, আর ভবিষ্যতে যার উপযুক্ত হ'ব ভবিষ্যতে তা লাভ করবো। আমাদের বর্তমান নির্ধারিত হয়েছে আমাদের অতীত দ্বারা, আর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে আমাদের বর্তমান দ্বারা। এটাই হচ্ছে শাস্ত্র নিয়ম। আজীবন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রায় সকল বিজ্ঞান ও দর্শন এবং সভ্য জগতের সকল ধর্মগ্রন্থ পাঠের পর এভাবেই সংক্ষেপে আমি আমার সুদৃঢ় বিশ্বাসের কথা বর্ণনা করলাম।<sup>১১</sup> শ্রীমদ্ভাগবদগীতা-তে নিষ্কাম কর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে কর্মই প্রধান; কর্মফল নয়—

কর্মন্যোবাধিকারস্তে মা ফলেসু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুর্ভূমা তে সঙ্গোহস্বকর্মাণি।

কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নহে। অতএব কর্ম কর। কর্মফলে যেন কখনো তোমার আসক্তি না হয়। কারণ কর্মফলের তৃষ্ণাই কর্মফল প্রাপ্তির হেতু হয়। সুতরাং কর্মফল প্রাপ্তির হেতু হইও না। অর্থাৎ কর্ম সকামভাবে করিও না। আবার কর্মত্যাগেও তোমার প্রবৃত্তি না হউক।<sup>১২</sup> ভারতীয় জনজীবনে সম্ভবত গীতার কর্মফলবাদ অপেক্ষা বৌদ্ধ কর্মতত্ত্বের অনেক বেশি প্রভাব আছে।

বৌদ্ধ কর্মতত্ত্বে ‘কৃত্যভেদে কর্ম’-এর শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে এইভাবে —

- জনককর্ম (Reproductive Karma)
- উপস্তুম্বক কর্ম (Supportive Karma)
- উপপীড়ক কর্ম (Obstructive Karma)
- উপঘাতক কর্ম (Destructive Karma)
- আসন্ন বা মরণাসন্ন কর্ম (Death Proximate Karma)

- আচরিত কর্ম (Habitual Karma)
- গুরুত্বপূর্ণ কর্ম (Weighty or Serious Karma)
- কৃত্ত্ব কর্ম বা সম্মিলিত কর্ম (Cumulative Karma)

এই সমস্ত কর্মের বিস্তৃত আলোচনা ও কর্মভেদে কর্মবিপাক ও কর্মফলের তারতম্যের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বহু বৌদ্ধ তত্ত্বগ্রন্থে।

### জন্মান্তরবাদ

গৌতমবুদ্ধ জীবের জন্মান্তর স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছিলেন —

‘অনেক জাতিসংসারং সন্দাবিস্সং অনিব্বিসং  
গহকারকং গবেসন্তো, দুষ্কা জাতি পুনশ্চুনং  
গহকারক দিটেঠাহসি, পুন গেহংন কাহসি,  
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্না গহকুটং বিসম্বিতং,  
বিসম্বারগতং চিন্তং তণহানং খয়মম্মুগা।

দেহরূপ গৃহ নির্মাতাকে অন্বেষণ করিতে, কিন্তু তাহাকে না পাইয়া কতবার ভ্রমণ করিলাম, কতবারই সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিলাম; পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ দুঃখকর। হে গৃহকারক, এইবার তোমাকে দেখিয়াছি, আর গৃহ নির্মাণ করিতে পারিব না (সংসারাবর্তে আর প্রত্যাবর্তন করিব না), তোমার সকল কাষ্ঠদণ্ড ভগ্ন হইয়াছে। গৃহকূট (গৃহচূড়াকণিকামণ্ডল) নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নির্বাণগত আমার চিন্তে সকল তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে।<sup>১০</sup> বস্তুত, এই জন্মান্তরবাদের উপর ভিত্তি করে সুবিখ্যাত রসগ্রাহী জাতককথা গড়ে উঠেছে। বৌদ্ধধর্ম মতে, মাতার ডিম্বাণু, পিতার শুক্রানু এবং গন্ধক্বেবা বা পুনর্জন্ম অন্বেষণকারী সত্ত্ব (Being to be born) —এই তিনের সমন্বয়ে জীবের সৃষ্টি। [অভিধম্মপিটকে এই তৃতীয় পদার্থকে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান (Re-Linking Consciousness) বলা হয়েছে।] কীভাবে তা সম্ভব? এই

তত্ত্বমতে, ‘অবিদ্যা’ জন্ম-মৃত্যুর কারণ। অবিদ্যার জন্য মানুষ ভালো-মন্দ কর্ম বিপাকে আবদ্ধ হয়। এই কর্ম অনুযায়ী কার্যকারণ সম্পর্কসূত্রেই পুনর্জন্ম ঘটে। জীবজগৎ স্ব-কর্ম অনুযায়ী ৩১টি লোকে (Planes of existence) জন্মগ্রহণ করে। এই ৩১টি লোক আবার তিনভাগে বিভক্ত — কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোক। কামলোককে দু’ভাগে ভাগ করা হয়েছে — দুর্গতভূমি ও সুগতভূমি। দুর্গতভূমির সংখ্যা চারটি — নরক, তির্যকযোনি, প্রেতযোনি, অসুরযোনি। আবার সুগতভূমি দু’টি — মনুষ্যলোক ও দেবলোক।

এই মনুষ্যলোকে সুখ-দুঃখ সবই থাকে। বোধিসত্ত্বগণ এই মনুষ্যলোকেই জন্মগ্রহণ করে সাধনার দ্বারা স্বধর্মপালনের নিষ্ঠায় দেবলোকে, রূপলোকে কিংবা অরূপলোকে পৌঁছায়। কিন্তু যতদিন না সাধকের নির্বাণলাভ সম্ভব হয়, ততদিনই অবিদ্যার কারণে কর্ম অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করতে হয়। দেহ বিনষ্ট হয়ে গেলেও কর্মশক্তি সচল থাকে। আর তখন বর্তমান বিজ্ঞান বা চিন্তের চ্যুতি ঘটে এবং অপর এক নতুন চিন্তের সৃষ্টি হয়। এই পুনর্জন্মগ্রহণকারী চিন্তা মাতৃগর্ভে দেহরূপ ধারণ করে। একই সঙ্গে পঞ্চস্কন্ধ উৎপন্ন হয়। বৌদ্ধ জন্মান্তর তত্ত্বমতে — ‘মৃত্যু হইতে নবজন্ম ধারণের সময়ের ব্যবধান এক চিন্তাক্ষণমাত্র। চ্যুতিচিন্তের পর, কর্মশক্তির দ্বারা নিষ্কিপ্ত হইয়া প্রতিসন্ধিচিন্তা ভবান্তরে জন্মগ্রহণ করে।’<sup>১৪</sup> এইভাবে জীবের জন্মান্তর ঘটে থাকে।

### বৌদ্ধ মৃত্যুভাবনা

বৌদ্ধ দর্শনে জন্মান্তর স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এরই সূত্রে জন্ম ও মৃত্যুর অনিবার্য কার্যকারণ সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে বৌদ্ধ কর্মতত্ত্ব ও প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির মধ্যে। জীবের জন্ম-মৃত্যু ও যাবতীয় দুঃখের কারণ অবিদ্যা। যদিও বৌদ্ধ দার্শনিকগণ মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নানারকম আলোচনা

করেছেন। অসাধারণ একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন প্রদীপ নিভে যাওয়ার ঘটনাকে উল্লেখ করে। প্রদীপ নিভে যায় — তেল ফুরিয়ে গেলে, সলিতা ফুরিয়ে গেলে, সলিতাও তেল উভয় ফুরিয়ে গেলে এবং অন্য কোনো বাহ্যিক কারণে, যেমন বাতাসের প্রভাবে। মানুষের মৃত্যু তেমনি চারভাবে সংঘটিত হয়—

জনক কর্মক্ষয় — যে কর্মশক্তির প্রভাবে জীবের জন্ম সংঘটিত হয়, সেই কর্মশক্তি শেষ হয়ে গেলে জীবের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুকে ‘কর্মফল মরণ’ বলা হয়। কর্মশক্তি ফুরিয়ে যাওয়ায় বুদ্ধ হওয়ার আগেই মৃত্যু ঘটে থাকে।

আয়ুক্ষয় — বুদ্ধ হয়ে আয়ু শেষ করে স্বাভাবিক মৃত্যুকে আয়ুক্ষয় মৃত্যু বলা হয়। বৌদ্ধ মতে ৩১টি লোক আছে (Planes of existence) এই ৩১টি লোকের কোনো লোকে কত পরমায়ু, তাহা নির্দিষ্ট আছে। জীব যখন পরমায়ুর শেষ সীমায় পৌঁছায় (Maximum age limit) তখন কর্মশক্তি থাকলেও মৃত্যু হয়। এই কর্মশক্তি যদি প্রবল শক্তিশালী হয়, তাহলে জীব একই লোকে বার বার জন্মগ্রহণ করে, অথবা কোনো উর্ধ্বতর লোকে জন্মগ্রহণ করে।

উভয়ক্ষয় — জনককর্মক্ষয় এবং আয়ুক্ষয় — এই উভয়ক্ষয়ে যে মৃত্যু সংঘটিত, তাকে উভয়ক্ষয় মৃত্যু বলা হয়।

উপচ্ছেদক কর্ম — যে কর্মশক্তির প্রভাবে জীবের জন্ম হয় সেই কর্মশক্তি অপেক্ষা অধিকতর ‘কর্ম’ (পূর্বজন্মের বা ইহজন্মের করা কর্ম) প্রভাবে আয়ু থাকা সত্ত্বেও মৃত্যু ঘটে থাকে। উল্লেখ আছে যে, দেবদত্ত ‘কৃত বুদ্ধরক্তপাতরূপ’ উপচ্ছেদক কর্মপ্রভাবে আয়ু থাকা সত্ত্বেও মারা গিয়েছিলেন।

এই প্রথম তিন প্রকার মৃত্যু হল — ‘কালমরণ’ এবং চতুর্থ প্রকার মৃত্যুটি ‘অকালমরণ’ নামে পরিচিত। বুদ্ধদেব বলেছেন, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার দ্বারা অন্ধকাররূপ অবিদ্যা দূর করে মানুষ যখন জীবন প্রবাহকে নির্বাণধাতুর দিকে চালিত করে তখন সংসারের বন্ধন থেকে অবসান ঘটে।

## নির্বাণ

বৌদ্ধদর্শনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—নির্বাণ। নির্বাণ সাধকের নিবিড় উপলব্ধি, চিন্তের চরম বিমুক্ত অবস্থা। ভাষা ও ভাব দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয় নির্বাণ তত্ত্বকে। নির্বাণ সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যায় — যে ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে, স্বয়ং উপলব্ধি করলে জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া কৃত বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় তাহাই নির্বাণ।<sup>১৫</sup> ‘ললিতবিস্তার’ গ্রন্থে বলা হয়েছে —

‘মৈত্রীবলেন জিত্বা পীতো মেহোন্মিন্নমৃতমণ্ডঃ।

করুণাবলেন জিত্বা পীতো মেহোন্মিন্নমৃতমণ্ডঃ।

মুদিতা বলেন জিত্বা পীতো হ্যন্মিন্ন মৃতমণ্ডঃ।

ভিন্না ময়া হবিদ্যা দীপ্তেন জ্ঞান কঠিন বজ্জেন। (২৪ অধ্যায়)

আমি এই বোধিমূলে বসিয়া প্রেম বলে জয় করিয়া অমৃতরস পান করিয়াছি, দয়াবলে জয় করিয়া অমৃতরস পান করিয়াছি, আনন্দবলে জয় করিয়া আনন্দরস পান করিয়াছি, আমি প্রদীপ্ত জ্ঞানাশনি দ্বারা অবিদ্যা ছেদন করিয়াছি।<sup>১৬</sup> অতএব নিবিড় সাধনায় অবিদ্যাকে ছিন্ন করে অমৃতরস সুধা আন্বাদনের নামই নির্বাণ। নির্বাণ প্রসঙ্গে অঘোরনাথ গুপ্ত লিখেছেন — ‘তাহা আত্মার এক বিশেষ অবস্থা কিন্তু ধ্বংস বা শূন্যভাব নহে। তাহা জীবনের অবিনশ্বর ভাব ও নির্মল সত্ত্ব; নিত্যতা পূর্ণতা, জ্ঞান শান্তি, পরিশুদ্ধি নির্বিকার সত্ত্ব। ... ইহাতে জ্ঞান আছে, বিনয় আছে, সত্য আছে, নীতি

আছে, প্রজ্ঞা আছে, স্মৃতি আছে, মোক্ষরস আছে, বীর্য আছে, বল আছে, সমাধি আছে, মৈত্রী করুণা আনন্দ আছে, শান্তি আছে।<sup>৭৭</sup> বুদ্ধদেব আত্মা মানতেন না কিন্তু পুনর্জন্ম ও কর্মবন্ধন মান্য করতেন। এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিত্ত যখন নিত্যপূর্ণ, অনন্তজ্ঞান, চিরশান্তি ও পূর্ণ পরিশুদ্ধ হয়, তখন চিত্তের সেই শুদ্ধসত্ত্বরূপই নির্বাণ।

সাধকের ‘আমিত্ব’ বা ‘অহং’ দূর হলে ‘চিত্ত’ নির্মল হয়। সমুদয় তৃষ্ণা দূর হলে, অবিদ্যা দূর হলে চিত্ত স্থির ধর্মজীবন প্রাপ্ত হয়। ‘এই অবস্থায় সকল দুঃখের অবসান, মুক্তিলাভ, শান্তিরসের উদয়, নির্বাণরূপ পরমতত্ত্বের আবির্ভাব; অনন্তজ্ঞান ও সত্ত্বদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন হয়।’<sup>৭৮</sup> নির্বাণ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন — ‘বেদান্ত দর্শনের চৌতলা দেবমন্দিরে বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ এবং ঈশান, এই তিন দেবতার তিনটি বিভিন্ন বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; চৌতলা দেওয়া হইয়াছে তুরীয় অবস্থাকে; এই স্থানটি জীবেশ্বরের ঐক্যস্থান বা সমাধিস্থান। এ অবস্থায় জীব সোহম জ্ঞানে ব্রহ্মত্বলাভ করে — এখানে রোগ নাই শোক নাই, তরতি শোকং তরতি পাপানং গুহ্যগ্রহিভ্যোবিমুক্তোহমৃতো ভবতি। বৌদ্ধ চৌতলা মন্দিরে নির্বাণমুক্তি ও ইহার অবিকল প্রতিচ্ছবি।’<sup>৭৯</sup> অবশ্য বেদান্তদর্শনের ব্রহ্মত্বলাভ এবং বৌদ্ধদর্শনের নির্বাণতত্ত্ব — ‘অবিকল প্রতিচ্ছবি’ — এই ধারণা গ্রহণীয় হয়নি বৌদ্ধ তান্ত্রিকদেব আলোচনায়। বিশেষ করে তিনি যখন লেখেন — বৌদ্ধমতে নির্বাণপ্রলয় সাগরে ডুবিয়া যাওয়া — ইহার উর্দ্ধে আর কিছুই নাই — অন্ধকার নিস্তদ্ধতা শূন্যতা, বিনাশ।<sup>৮০</sup> নির্বাণ সম্পর্কে এই ধারণা যথার্থ নয়। বৌদ্ধ দর্শন কখনই এই ‘নেতি’ বা শূন্য বা বিনাশের কথা বলে না। নির্বাণতত্ত্বে এই নেতিবাচক উপলক্ষিবোধ একেবারে নেই। বরং নির্বাণচিত্তের অত্যুন্নত অবস্থা। নির্বাণে বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ সম্ভব। ললিতবিস্তারে লেখা হয়েছে —

ইহ তন্ময়াহনুবুদ্ধং সর্বপরপ্রবাদিভির্ষদপ্রাপ্তম্।

অমৃতং লোকহিতায়ং জরামরণশোকদুঃখান্তম্।।

অন্যমতাবলম্বীগণ যাহা প্রাপ্ত হয় নাই, আমি এখানে লোক হিতার্থে সেই অমৃত বুঝিয়াছি। যাহাতে জরামরণ শোক বিনষ্ট হয়।<sup>১১</sup> মানব কল্যাণে যে বোধিজ্ঞান, যে জ্ঞান অপার অমৃতময় আনন্দ— তা অন্ধকার শূন্যতা বা বিনাশের নয়। নির্বাণ যদি একান্তশূন্য হত তাহলে কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন হত না। এই প্রসঙ্গে আলোচক লিখেছেন — ‘নির্বাণ সর্বশূন্য নহে। বুদ্ধ বলিয়াছেন — অথি নিক্বুতি, ন নিক্বুতি পুমা। নিবৃত্তি চিরদিনই আছে, ছিল ও থাকিবে। কিন্তু নিবৃত্ত (নির্বাণিত) কোনো ব্যক্তি ছিল না, বর্তমানে নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না। ইহাই নির্বাণের শূন্যতা বা বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদ। ... নির্বাণ নঞর্থক। যেহেতু ইহাতে আছে রাগ দ্বেষ মোহের নিরবশেষ ধ্বংস। কিন্তু ইহা সদর্থক যেহেতু ইহা ধ্রুব, শাস্ত, শুভ এবং সুখময়।<sup>১২</sup> নির্বাণ অনন্ত (endless), অসংস্কৃত (non-conditioned) অনুত্তর (supreme) পরায়ণ (highest refuge) ত্রাণ (sefty) যোগক্ষেম (sefty and security), অনালয় (abodeless) অক্ষয় (imperishable), বিশুদ্ধ (absolute purity), লোকত্তর (supra-mundane), অমৃত (immortality), মুক্তি (emancipation), শান্তি (peace) এবং পরমং সুখং (bliss supreme)। এই নির্বাণলাভের পর সাধকের তিনটি অবস্থা হয় — বোধিসত্ত্ব, অর্হৎ এবং বুদ্ধ। উন্নতির চরম অবস্থা — বুদ্ধ। শাক্যসিংহ সিদ্ধার্থ পূর্ণতালাভ করে বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন।

বৌদ্ধধর্মে ‘নির্বাণতত্ত্ব’ নিয়ে আরও বিস্তৃত ও গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা আছে বৌদ্ধ তত্ত্বগ্রন্থগুলিতে। তবে গৌতমবুদ্ধ কখনই তত্ত্বকে বেশি গুরুত্ব দেননি। তিনি জীবনাচরণ দিয়ে সত্য উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন। মানবকল্যাণ চিন্তা, মানবের মুক্তি চিন্তাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ কথা।

সংচিন্তা, সংজ্ঞান, সংবাক্য ইত্যাদি মার্গ পালন ও শীলব্রত পালনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানব সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ, মানুষের আত্মিক উৎকর্ষসাধন, ব্যক্তির আনন্দজ্ঞান লাভ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চমৎকার লিখেছেন — ‘যারা বলে ধর্মনীতিই বৌদ্ধধর্মের চরম তারা ঠিক কথা বলেন না। মঙ্গল একটা উপায়মাত্র। তবে নির্বাণই চরম? তা হতে পারে কিন্তু সেই নির্বাণটি কী? সে কী শূন্যতা? যদি শূন্যতাই হত তবে পূর্ণতার দ্বারা তাতে গিয়ে পৌঁছানো যেত না। তবে কেবলই সমস্তকে অস্বীকার করতে করতে, নয় নয় বলতে বলতে, একটার পর একটা ত্যাগ করতে করতেই, সেই সর্বশূন্যতার মধ্যে নির্বাণলাভ করা যেত। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে সে পথের ঠিক উল্টো পথ দেখি যে। তাতে কেবল তো মঙ্গল দেখছি নে, মঙ্গলের চেয়ে বড়ো জিনিস দেখছি যে, মঙ্গলের মধ্যে একটা প্রয়োজনের ভাব আছে। অর্থাৎ তাতে একটা কোনো ভালো উদ্দেশ্য সাধন করে, কোনো একটা সুখ হয় বা সুযোগ হয়।

কিন্তু প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা, সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলই দেওয়া। যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা, সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ — তিনি নেন না।

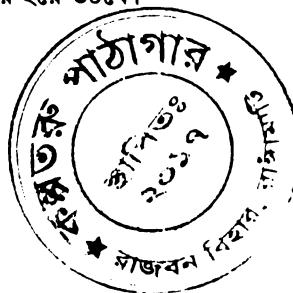
এই প্রেমের ভাবে, এই আদান বিহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্যে বুদ্ধদেবের উপদেশ আছে, তিনি তাঁর সাধনপ্রণালীও বলে দিয়েছেন।

এ তো বাসনা সংহরণের প্রণালী নয়, এ তো বিশ্ব হতে বিমুক্ত হওয়ার প্রণালী নয়, এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম মেস্তিভাবনা — মৈত্রীভাবনা।... প্রত্যহশীল সাধনার দ্বারা



তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রীভাবনার দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদিন এই কথা স্মরণ করো যে, আমার শীল অখণ্ড আছে, অহিংস আছে এবং প্রতিদিন চিন্তকে এই ভাবনায় নিবিষ্ট করো যে, ক্রমশ সকল বিরোধ কেটে গিয়ে আমার আত্মা সর্বভূতে প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ একদিকে বাধা কাটছে, আর একদিকে স্বরূপলাভ হচ্ছে। এই পদ্ধতিকে তো কোনো ক্রমেই শূন্যতালাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিল লাভের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মলাভের পদ্ধতি।<sup>১০</sup>

বৌদ্ধধর্মে সাধনার চরম অবস্থায় পৌঁছে, সাধক উপলব্ধি করেন, এই নিখিলের মাঝে, এই মানবের মাঝে, মৈত্রী ও প্রেমের সহস্র সুধাধারা অবিরত বয়ে চলেছে। তখন তিনিও পরমানন্দে সেই শাস্বত সুখময় উপলব্ধিতে আত্মমগ্ন হন। মানবসমাজও অহংমুক্ত হয়ে ‘সত্য-শীল-প্রজ্ঞা’ পালনের মধ্যে দিয়ে নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় যত বেশি অবগাহন করবে, ততই এই বিশ্বসংসার আনন্দময়, কল্যাণময় হয়ে উঠবে।



## বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস

রাজপুত্র সিদ্ধার্থের মগ্ধচৈতন্যে দোলা লাগিয়েছিল মানুষের চূড়ান্ত দুঃখ দুর্দশা। মাত্র ২৯ বছর বয়সে সংসারের সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেন দুঃখ, জরা ও মরণকে জয় করার উদ্দেশ্যে। দীর্ঘদিন কঠোর সাধনার পর ৩৫ বছর বয়সে নৈরঞ্জনা নদীতীরে বোধিবৃক্ষতলে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বারানসীর সারনাথে পাঁচ শিষ্যের মধ্যে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। রাজগৃহে তাঁর ধর্মগ্রহণ করেন মহারাজা বিম্বিসার, শারিপুত্র ও মৌদগলায়ন। ক্রমশঃ তিনি ধর্ম প্রচার করেন গয়া, উরুবিশ্ব, নালান্দা, পাটলিপুত্র। দীর্ঘ ৪৫ বছর এই সমস্ত স্থানে মানুষের মধ্যে ধর্মকথা প্রচার করে ৮০ বছর বয়সে মহামানব গৌতমবুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। তাঁর জীবিতকালে এই ধর্মের ভৌগোলিক পরিসর সীমিত ছিল। এই ধর্মকে বিশ্বধর্মে পরিণত করেছিলেন মহারাজাধিরাজ অশোক।

করুণাময় বুদ্ধদেব যতদিন জীবিত ছিলেন, তাঁর সৌম্য স্নিগ্ধ চোখের আলোয় সবাই আলোকিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর জীবিতকালেই এই ধর্মের সুদূর প্রসারী অস্তিত্ব সন্দিহান হয়েছিলেন তিনি নিজেই। কারণ, বৌদ্ধসংঘে নারীর কোনো স্থান ছিল না। কিন্তু সৌগত বুদ্ধদেবের বিমাতা ও মাসী পরমা সাধ্বী অতিবৃদ্ধা মহাপ্রজাপতি সংঘে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। বুদ্ধদেব তাঁকে ফিরিয়ে দেন। তবু বার বার তিনবার আনন্দ তাঁর হয়ে প্রার্থনা করলে বুদ্ধদেব বলেছিলেন মহাপ্রজাপতি ‘আটটি প্রধান ধর্ম’ পালন করলে দীক্ষা দেওয়া সম্ভব। সমস্ত নিয়ম অন্তর থেকে পালন করতে চাইলে

বুদ্ধদেব ধর্মপ্রদানে সম্মত হয়েছিলেন। তবে সেইসঙ্গে তিনি এও বলেছিলেন — ‘আনন্দ, স্ত্রীলোকেরা যদি সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণী হইয়া তথাগতের ধর্ম ও নিয়ম পালনের অনুমতি না পাইত তবে ধর্ম চিরস্থিতিক হইত, সর্দম সহস্রবর্ষ স্থায়ী হইত। কিন্তু আনন্দ, এখন তাহারা যখন এই অনুমতি পাইল তখন সধর্ম ততদিন স্থায়ী হইবে না, মাত্র পাঁচশত বৎসর স্থায়ী হইবে। আনন্দ যে গৃহে বহু স্ত্রীলোক কিন্তু অল্প পুরুষ বাস করে, সে গৃহ যেমন চোর ও দস্যুরা সহজেই ধ্বংস করিতে পারে, সেরূপ, যে ধর্মনিয়মে স্ত্রীলোককে সংসার ছাড়িয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় তাহাও চিরস্থিতিক হইতে পারে না; যেমন উত্তম ধান্যক্ষেত্রে সেতটঠিকা রোগ লাগিলে সে ক্ষেত্র চিরস্থায়ী হয় না, যেমন উত্তম ইক্ষুক্ষেত্রে সঙ্কেটঠিকা রোগ লাগিলে তাহা চিরস্থায়ী হয় না, সেইরূপ যে ধর্মনিয়মে স্ত্রীলোকদিগের প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় তাহাও চিরস্থায়ী হয় না।’<sup>১৪</sup> অবশ্য বুদ্ধদেব একথা বলেছেন কিনা — এ বিষয় আধুনিক গবেষকদের অধিকাংশই সন্দিহান হয়েছেন। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে নারী প্রবেশের বিরোধী ছিলেন কিন্তু নারীদের প্রতি এতখানি বিরাগ ছিল না তাঁর। ‘তবে যে কোনো নারীকে নির্বিচারে সম্বন্ধে প্রবেশ করিতে দেওয়ায় সম্ভবত তাঁহার আপত্তি ছিল এবং ইহাই স্বাভাবিক।’<sup>১৫</sup> তাঁর মৃত্যুর পর এই ধর্মে, বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধধর্মে নারীর অবাধ প্রবেশে ধর্মকে শুদ্ধ রাখা ও সংগঠিত করে রাখা সম্ভব হয়নি।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ১০০ বছরের মধ্যেই শুরু হয় দল বিভাজন। মহারাজা কালাশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির দ্বিতীয় অধিবেশনে বিহার জীবনের দশটি (১০টি) আচরণীয় বিধানকে কেন্দ্র করে মহাসঙ্গিকদের সঙ্গে (বৈশালী ও পাটলিপুত্রের বৌদ্ধ শ্রমণ), স্থবিরবাদীদের (কৌশাস্থী এবং অবন্তীর বৌদ্ধ শ্রমণ), মতান্তর চরমে ওঠে। উল্লেখ্য যে মহাসাঙ্ঘিক এবং স্থবিরবাদী সাধকগণ উভয়েই হীনযান বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। আবার

এই হীনযানের অন্তর্ভুক্ত স্থবিরবাদীগণ বা থেরবাদীগণ এগোরোটি এবং মহাসাঙ্ঘিকগণ সাতটি এই ১৮টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন তাঁরা। প্রবোধচন্দ্র বাগচী লিখেছেন — ‘প্রাচীন সংঘের ভিতর অশোকের পূর্বেই প্রায় আঠারোটি শাখার সৃষ্টি হয়েছিল। এই শাখাগুলির মধ্যে দশটি শাখা কালক্রমে প্রভাবসম্পন্ন হয়ে ওঠে। এই দশটি শাখার নাম হচ্ছে : স্থবিরবাদ (পালিতে থেরবাদ), হৈমবত, ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সর্বাঙ্গিবাদ, মূলসর্বাঙ্গিবাদ, সখিতীয়, মহাসাংঘিক ও লোকোত্তরবাদ। এ দশটিকে আবাব দু’দলে ভাগ করা চলে। প্রথম আটটির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ খুব নিকট।’

মহারাজা অশোকের সময় পাটলিপুত্রে বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির তৃতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে থেরবাদকে নিষ্ঠাবান বৌদ্ধধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয়। বস্তুত, এই সময় বৌদ্ধধর্মের জগৎজোড়া বিস্তার। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে চতুর্থ মহাসঙ্গীতির অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহারাজা কনিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধদার্শনিক পার্শ্বের সভাপতিত্বে কাশ্মীরে এই অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে মহাযান বৌদ্ধধর্মের জন্ম হয়। অল্প সময়ে এই মহাযান বৌদ্ধধর্ম অনেক বেশি সাধারণের উপযোগী হয়ে ওঠে। মহাযান বৌদ্ধদের কাছে ‘বোধিসত্ত্ব’ সম্পর্কে ধারণা পাল্টে যায়।

থেরবাদী বৌদ্ধগণ মনে করতেন, বুদ্ধত্বলাভের জন্য যত্নবান সত্ত্বই ‘বোধিসত্ত্ব’। বহু জন্মে বোধিসত্ত্বলাভের পর অন্তিম জন্মে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি ঘটে। জাতক কথায় উল্লেখিত বুদ্ধদেবের যে জন্মান্তর এবং প্রতিটি জন্মে বুদ্ধত্বলাভের জন্য যে আত্মিক প্রচেষ্টা — সেই প্রতিটি জন্মের রূপগুলিই ছিল বোধিসত্ত্বরূপ। কারণ, প্রতিটি জন্মান্তরে তাঁর মধ্যে বোধিচিহ্নের বিকাশ ঘটেছে। বহু জন্মের এমনই সযত্ন প্রয়াসের ফলে বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভ।

মহাযান বৌদ্ধধর্মে বোধিসত্ত্বের ধারণা পাল্টে যায়। বোধিসত্ত্বের স্বরূপের পরিবর্তন ঘটে। সৃষ্টি হয় বহু কল্পিত বোধিসত্ত্বমূর্তি। এই ধর্মদর্শন মতে বিশ্ব সংসারের কোনো প্রাণিকে জন্মান্তরের বাঁধনে বদ্ধ রেখে ‘বোধিসত্ত্ব’ নির্বাণলাভ করতে পারেন না। অর্হতত্ত্ব বোধিসত্ত্বের লক্ষ্য নয়। নির্বাণ বোধিজ্ঞান লাভ তাদের মতে স্বার্থপরতা। সমস্ত প্রাণির মুক্তির জন্য বোধিসত্ত্ব দুঃখ ও করুণার প্রতিমূর্তি। মহাযান ধর্মমত অনুযায়ী মানুষের মুক্তির জন্য ধ্যানীবুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের উদ্ভব। ‘বৌদ্ধদের আদিতত্ত্ব গুহ্যসমাজ গ্রন্থে এই বিবর্তনের একটি জাঁকালো বিবরণ দেওয়া আছে। সেখানে দেখা যায় কায়বাক্চিস্ত বজ্র সমাধিগ্রহণ করিতেছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাধিতে সমাধিস্থ ইহবার পর এক একটি শব্দ উদ্ভিত হইতেছে। এবং এই ধ্বনি ক্রমশ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া এক একটি ধ্যানী বুদ্ধ আকারে পরিণত হইতেছে।<sup>১১</sup> এই বৌদ্ধদেবতাদের উদ্ভব প্রসঙ্গে বিনয়তোষ ভট্টাচার্য আরও লিখেছেন — ‘বৌদ্ধতন্ত্র বলে সাধনা করিলে প্রথমে শূন্যতার বোধ হয়, দ্বিতীয়ে বীজমন্ত্রের দর্শন হয়। তৃতীয়ে বীজমন্ত্র হইতে বিশ্ব অথবা দেবতার অস্পষ্ট আকার দেখা যায়। এবং অবশেষে দেবতার সুস্পষ্ট মূর্তি দর্শন হইয়া থাকে। সে মূর্তি অতি মনোহর সর্বাঙ্গসুন্দর কল্পনার অতীত, স্বর্গীয় বর্ণে রঞ্জিত এবং নানা প্রকার দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার ও অস্ত্রশস্ত্রে শোভিত।<sup>১২</sup> এইভাবে মহাযান বৌদ্ধধর্মে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ (বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য) ও তাঁদের শক্তি (মামকী, পাণ্ডুরা, তারা, লোচনা, বজ্রধাতীশ্বরী, বজ্রসত্ত্বাত্মিকা) এবং বোধিসত্ত্ব মণ্ডল ও তাঁদের শক্তি। শুরু হয়ে যায় বুদ্ধমূর্তি, বোধিসত্ত্বমূর্তি ও তাঁদের শক্তিদেবতার পূজার প্রচলন। বৌদ্ধ বিহারগুলিতে এমনকি, মন্দিরের মধ্যে দেবতাদের আসনে বিরাজিত হয় বুদ্ধমূর্তিগুলি। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে মহাযান বৌদ্ধধর্ম।

হীনযান বা থেরবাদী বৌদ্ধধর্মে বৌদ্ধশ্রমণদের লক্ষ্য ছিল নির্বাণলাভ। কঠোর সাধনা করে, আত্মিক প্রচেষ্টায় ‘আত্মদীপ’ হতে হবে। তার জন্য বুদ্ধ নির্দেশিত সাধন বিধি কঠোরভাবে পালন করাই ছিল থেরাবাদীদের কাজ। অন্যদিকে মহাযান বৌদ্ধধর্মে বৌদ্ধশ্রমণ, সাধারণ-গৃহী, এমনকি জীবজন্তুদের মুক্তির কথা বলা হয়েছে। বোধিসত্ত্ব মনে করতেন,<sup>১১</sup> একাকী মুক্ত হওয়ার মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই, অসংখ্য প্রাণিকে মুক্ত করা প্রয়োজন। আসলে মহাযান বৌদ্ধ শ্রমণগণ সামগ্রিক শুভবোধ ও কল্যাণ কামনায় ব্রতী ছিলেন। আদর্শ চিন্তা ও আশাবাদ এই দুই সদর্থক মানবতাবাদে বিশ্বাস করতেন তাঁরা। তাঁরা মনে করতেন পার্থিব মানুষ অপরিণত ইন্দ্রিয়াদির অধীনে থাকে। তাই ইহলৌকিক সুখের অলীক স্বপ্নের মরীচিকায় কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত মানুষ যখন উপলব্ধি করেন জীবন গোলকধাঁধাময়, তখন আপন অন্তরপ্রয়াসে মুক্তির পথে এগিয়ে চলে মানুষ। মানবজীবনের সঙ্গে এমনভাবে সংলগ্ন হয়েছিল মহাযান ধর্মমত।

প্রাক্ গুপ্তযুগে বৌদ্ধধর্ম, বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র ব্যপ্ত হয়; এমনকি বৃহত্তর ভারতের বাইরেও প্রবল আধিপত্য বিস্তার করে। ‘হীনযান মতাদর্শের সর্বাঙ্গিবাদী এবং মহাসাধিকরাই মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এছাড়া ধর্মগুপ্তক (সর্বাঙ্গিবাদ মতবাদের মহীশাসক সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত) এবং বহুশ্রুতীয় (মহাসাধিকদের একটি সম্প্রদায়) ও কাশ্যপীয় (সর্বাঙ্গিবাদী সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত) সম্প্রদায়ও এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারত থেকে বণিক ও তাদের পরিবারদের গমনের এবং বসতি স্থাপনের ফলে মধ্য এশিয়ায় বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতীয় বংশোদ্ভূত সেই অঞ্চলের অধিবাসীরা বৌদ্ধধর্ম

প্রসারে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ করতে থাকে।<sup>১০</sup> তবে গুপ্তযুগে এদেশে এই ধর্মের অপ্রতিহত গতি কিছুটা রুদ্ধ হয়। ইতিহাসে গুপ্তযুগ পৌরাণিক ধর্মের উত্থানের যুগ। হিন্দু ধর্মে এই সময় নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটেছিল। ‘পরমভাগবত’ গুপ্তরাজাগণ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন এবং শৈব ধর্মের পোষকতা করতেন। তবে বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিরূপ ছিলেন না তাঁরা। নলিনীনাথ দাশগুপ্ত লিখেছিলেন — ‘গুপ্ত সমসাময়িককালে প্রাচীন ভাগবতধর্ম নতুন নতুন রূপাক্তি ও বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়ে বৈষ্ণবধর্মে পরিণত হলো। অনুরূপভাবে এই সময়কার পরমত সহিষ্ণুতার যুগে মুক্ত উদার ও স্বচ্ছন্দ আবহাওয়ার মধ্যেই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এ দুয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধিত হয়েছিল, ফলে হিন্দুগণ বুদ্ধকে বিষ্ণুর দশম অবতার বলে গ্রহণ করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়।’<sup>১১</sup> আসলে গুপ্ত যুগের মহারাজাগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী হলেও — ‘সর্ব ধর্মের প্রতি বিশেষত বৌদ্ধধর্মের প্রতি বরাবরই শ্রদ্ধাবান বলে মনে হয়। হিউয়েন ত্সং বর্ণিত তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত অনুযায়ী নালন্দা বিহারের গোড়াপত্তন এবং সারনাথস্থ বৌদ্ধ বিহারের ধর্মশিক্ষা ও সংস্কৃতি সাধনায় তাঁদের বিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ আছে। এছাড়াও এই গুপ্ত যুগে ঐক্য, শিক্ষা, শান্তি, প্রগতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল।’<sup>১২</sup> অতএব গুপ্তযুগেও বৌদ্ধধর্ম স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকে পঞ্চম শতক পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বহু শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। তবে দার্শনিক অভিপ্রায়ের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে চারটি সম্প্রদায়। প্রবোধচন্দ্র বাগচী লিখেছেন — ‘বৌদ্ধধর্মের মূল সূত্রগুলির বা বুদ্ধের বাণীর তত্ত্ব নির্দেশ করতে গিয়ে কালক্রমে নানা দার্শনিক মতের সৃষ্টি হয়েছিল। সে সব বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের ভিতর চারটি সম্প্রদায় নিজেদের বিশিষ্ট অধ্যাত্মদৃষ্টি বা দর্শনের জন্য বৌদ্ধসংঘে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল ও বহুদিন ধরে তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই

হীনযান বা থেরবাদী বৌদ্ধধর্মে বৌদ্ধশ্রমণদের লক্ষ্য ছিল নির্বাণলাভ। কঠোর সাধনা করে, আত্মিক প্রচেষ্টায় ‘আত্মদীপ’ হতে হবে। তার জন্য বুদ্ধ নির্দেশিত সাধন বিধি কঠোরভাবে পালন করাই ছিল থেরাবাদীদের কাজ। অন্যদিকে মহাযান বৌদ্ধধর্মে বৌদ্ধশ্রমণ, সাধারণ-গৃহী, এমনকি জীবজন্তুদের মুক্তির কথা বলা হয়েছে। বোধিসত্ত্ব মনে করতেন,<sup>১১</sup> একাকী মুক্ত হওয়ার মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই, অসংখ্য প্রাণিকে মুক্ত করা প্রয়োজন। আসলে মহাযান বৌদ্ধ শ্রমণগণ সামগ্রিক শুভবোধ ও কল্যাণ কামনায় ব্রতী ছিলেন। আদর্শ চিন্তা ও আশাবাদ এই দুই সদর্থক মানবতাবাদে বিশ্বাস করতেন তাঁরা। তাঁরা মনে করতেন পার্থিব মানুষ অপরিণত ইন্দ্রিয়াদির অধীনে থাকে। তাই ইহলৌকিক সুখের অলীক স্বপ্নের মরীচিকায় কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত মানুষ যখন উপলব্ধি করেন জীবন গোলকধাঁধাময়, তখন আপন অন্তরপ্রয়াসে মুক্তির পথে এগিয়ে চলে মানুষ। মানবজীবনের সঙ্গে এমনভাবে সংলগ্ন হয়েছিল মহাযান ধর্মমত।

প্রাক্ গুপ্তযুগে বৌদ্ধধর্ম, বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র ব্যপ্ত হয়; এমনকি বৃহত্তর ভারতের বাইরেও প্রবল আধিপত্য বিস্তার করে। ‘হীনযান মতাদর্শের সর্বাঙ্গিবাদী এবং মহাসাধ্বিকরাই মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এছাড়া ধর্মগুপ্তক (সর্বাঙ্গিবাদ মতবাদের মহীশাসক সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত) এবং বহুশ্রুতীয় (মহাসাধ্বিকদের একটি সম্প্রদায়) ও কাশ্যপীয় (সর্বাঙ্গিবাদী সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত) সম্প্রদায়ও এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারত থেকে বণিক ও তাদের পরিবারদের গমনের এবং বসতি স্থাপনের ফলে মধ্য এশিয়ায় বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতীয় বংশোদ্ভূত সেই অঞ্চলের অধিবাসীরা বৌদ্ধধর্ম



প্রসারে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ করতে থাকে।<sup>১০</sup> তবে গুপ্তযুগে এদেশে এই ধর্মের অপ্রতিহত গতি কিছুটা রুদ্ধ হয়। ইতিহাসে গুপ্তযুগ পৌরাণিক ধর্মের উত্থানের যুগ। হিন্দু ধর্মে এই সময় নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটেছিল। ‘পরমভাগবত’ গুপ্তরাজাগণ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন এবং শৈব ধর্মের পোষকতা করতেন। তবে বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিরূপ ছিলেন না তাঁরা। নলিনীনাথ দাশগুপ্ত লিখেছিলেন — ‘গুপ্ত সমসাময়িককালে প্রাচীন ভাগবতধর্ম নতুন নতুন রূপাক্তি ও বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ হয়ে বৈষ্ণবধর্মে পরিণত হলো। অনুরূপভাবে এই সময়কার পরমত সহিষ্ণুতার যুগে মুক্ত উদার ও স্বচ্ছন্দ আবহাওয়ার মধ্যেই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এ দুয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধিত হয়েছিল, ফলে হিন্দুগণ বুদ্ধকে বিষ্ণুর দশম অবতার বলে গ্রহণ করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়।’<sup>১১</sup> আসলে গুপ্ত যুগের মহারাজাগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী হলেও — ‘সর্ব ধর্মের প্রতি বিশেষত বৌদ্ধধর্মের প্রতি বরাবরই শ্রদ্ধাবান বলে মনে হয়। হিউয়েন বর্ণিত তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত অনুযায়ী নালন্দা বিহারের গোড়াপত্তন এবং সারনাথস্থ বৌদ্ধ বিহারের ধর্মশিক্ষা ও সংস্কৃতি সাধনায় তাঁদের বিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ আছে। এছাড়াও এই গুপ্ত যুগে ঐক্য, শিক্ষা, শান্তি, প্রগতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল।’<sup>১২</sup> অতএব গুপ্তযুগেও বৌদ্ধধর্ম স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকে পঞ্চম শতক পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বহু শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। তবে দার্শনিক অভিপ্রায়ের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে চারটি সম্প্রদায়। প্রবোধচন্দ্র বাগচী লিখেছেন — ‘বৌদ্ধধর্মের মূল সূত্রগুলির বা বুদ্ধের বাণীর তত্ত্ব নির্দেশ করতে গিয়ে কালক্রমে নানা দার্শনিক মতের সৃষ্টি হয়েছিল। সে সব বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের ভিতর চারটি সম্প্রদায় নিজেদের বিশিষ্ট অধ্যাত্মদৃষ্টি বা দর্শনের জন্য বৌদ্ধসংঘে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল ও বহুদিন ধরে তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই

চারটি সম্প্রদায়ের নাম হচ্ছে — ‘বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার। ব্যবহারিক সংজ্ঞা দিতে গেলে — বৈভাষিক সৌত্রান্তিককে হীনযান ও মাধ্যমিক ও যোগাচারকে মহাযান বলতে হয়।’<sup>১০</sup> প্রধান এই চারটি দার্শনিক সম্প্রদায় সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল —

### বৈভাষিক দর্শন

মহারাজা কনিষ্কের সময় চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি সম্পূর্ণ হয়েছিল আচার্য বসুমিত্র ও কবি দার্শনিক অশ্বঘোষের তত্ত্বাবধানে। এই সঙ্গীতির পর তিন লক্ষ শ্লোকের একটি টীকাগ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল। এর নাম দেওয়া হয়েছিল ‘বিভাষা’ বা ‘মহাবিভাষা’ শাস্ত্র। সর্বাস্তিবাদীদের মধ্যে যারা এই ‘বিভাষা’-র দার্শনিক তত্ত্ব মেনে নিয়েছিলেন, তাদের বৈভাষিক বলা হয়।<sup>১১</sup> বস্তুত অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থগুলি অবলম্বন করে এই বিভাষা তৈরি হয়েছিল। সর্বাস্তিবাদীদের সাতখানি অভিধর্ম বা দার্শনিক গ্রন্থই বৈভাষিক শাস্ত্র। এই গ্রন্থগুলি হল জ্ঞানপ্রস্থান, ধর্মস্কন্ধ, সংস্কীতপর্যায়, বিজ্ঞপ্তিবাদ, প্রকরণপাদ, প্রজ্ঞপ্তিসার ও ধাতুকায় পাদশাস্ত্র। সর্বাস্তিবাদ তথা বৈভাষিকদের প্রধান আচার্য ছিলেন কাত্যায়নীপুত্র। তিনিই রচনা করেছিলেন ‘জ্ঞানপ্রস্থান’ গ্রন্থটি। চতুর্থ শতকে বসুবন্ধু রচিত ‘অভিধর্মকোষ’ শাস্ত্র গ্রন্থটি জ্ঞানপ্রস্থান-এর টীকা।

বৈভাষিকগণ অস্তিবাদী বা realists ছিলেন। বস্তুসমূহের স্থায়ী বাস্তবিকতায় বিশ্বাস করতেন তাঁরা। তবে আত্মা বা পুদগলের (individuality) অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। তাঁদের মতে নির্বাণ আনন্দময় অনুভূতি। তাঁরা পঞ্চস্কন্ধ ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু সমূহের অস্তিত্ব ও বস্তুত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। “বৈভাষিকেরা ‘ধর্ম’ শব্দের যে অর্থ নির্দেশ করলেন তা পাশ্চাত্য দর্শনের phenomenon -এর প্রতিশব্দ বলা চলে। যা স্বলক্ষণ বা নিজের বিশিষ্ট লক্ষণ ধারণ করে তাই হল ধর্ম। ধর্ম হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, ইন্দ্রিয়ের সেই

গ্রহণ ব্যাপারেই ধর্মের বিশেষ লক্ষণসমূহ ধরা পড়ে। আর ধর্মের প্রকৃত স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপন্ন না হলে মুক্তি হয় না।<sup>১৫</sup> বৈভাষিক দর্শন মতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহের স্বভাব বা ‘ধর্ম’ ৭৫ প্রকার। এই ধর্ম সমূহের দু’টি ভাগ— সংস্রব বা সংস্কৃত বা conditioned ও অনাস্রব বা অসংস্কৃত বা unconditioned ধর্ম। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান — এই পঞ্চস্কন্ধাত্মক ধর্মসমূহকে সংস্কৃত ধর্ম বলা হয়। সংস্কৃত ধর্ম ৭২ প্রকার। অসংস্কৃত ধর্মের সংখ্যা তিনটি — আকাশ, প্রতিসংখ্যা নিরোধ এবং অপ্রতি সংখ্যা নিরোধ। এই ৭২ প্রকার সংস্কৃত ধর্মের চারটি ভাগ — রূপ, চিত্ত, চিত্ত বিপ্রযুক্ত ধর্ম এবং আরও একটি ধর্ম—যা মানসিক নয় ও ভৌতিক নয়। উল্লেখ্য যে, এই বৈভাষিক ধর্মের প্রবক্তাগণ হলেন কাত্যায়নীপুত্র, ঘোষক, বুদ্ধদেব, ধর্মত্রাত, ভদন্ত, সংঘভদ্র, দীপকার।

### সৌত্রান্তিক দর্শন

সর্বাস্তিবাদেরই অন্তর্গত সৌত্রান্তিক দর্শন। বৈভাষিকদের কিছু পরে এই দর্শনের সৃষ্টি হয়েছিল। ‘খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে সর্বাস্তিবাদের আচার্য কুমাররাত বা কুমারলাভ এবং তাঁর শিষ্য হরিবর্মণ এই মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সৌত্রান্তিকদের প্রামাণিক গ্রন্থ হরিবর্মণের ‘সত্য সিদ্ধিশাস্ত্র’। সৌত্রান্তিক দার্শনিকগণ অভিধর্ম ও বিভাষা গ্রন্থগুলিকে ‘প্রামাণিক’ বলে স্বীকার করেননি। তাঁদের মতে বুদ্ধের বাণী সম্যক উপলব্ধি করতে হলে সূত্রগুলির স্মরণ নিতে হবে।<sup>১৬</sup> তাঁদের মতে আত্মার অস্তিত্ব নেই; এমনকি পঞ্চ স্কন্ধাত্মক ধর্মেরও কোনো অস্তিত্ব বা বস্তুত্ব নেই। স্বভাব — ধর্মশূন্য; কারণ তা ক্ষণিক। এর কোনো অতীত বা ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব বা বস্তুত্ব নেই, আছে শুধু ক্ষণিক স্থায়িত্ব। ‘ধর্মের প্রকৃত স্বভাব প্রতিমুহূর্তে বিনষ্ট হচ্ছে ও তার নতুন স্বভাবের উৎপত্তি হচ্ছে। এতে শুধু ধর্মের প্রবাহ-ই সৃষ্টি হচ্ছে, সে প্রবাহের

প্রত্যেক ধর্মই অনিত্য বা ক্ষণিক। এই ধর্মপ্রবাহ continuous phenomena মাত্র।<sup>১১</sup> সৌত্রান্তিক দার্শনিকদের মতে, পঞ্চস্কন্ধময় ধর্মসমূহের আর একটি লক্ষণ ‘অনিত্যতা’। অর্থাৎ যে মুহূর্তে ধর্মের উৎপত্তি হয়, সেই মুহূর্তেই তার বিনাশ হয়। তাদের মতে আমাদের বিজ্ঞান প্রবাহেই শুধু ধর্মের অস্তিত্ব। ‘সে ধর্মের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়, অনুমেয়, deductive। বৈভাষিকদের নির্বাহ বাস্তব, অনাস্তব আনন্দময় অবস্থা, ভাবস্বভাব বা positive; আর সৌত্রান্তিকের নির্বাহ অবাস্তব ও অভাব-স্বভাব বা unreal ও negative.’<sup>১২</sup> সৌত্রান্তিক দর্শনের প্রবক্তাগণ হলেন কুমাররাত, হরিবর্মণ, বসুবন্ধু, যশোমিত্র, পরমার্থ, স্থিরমতি।

মাধ্যমিক বা শূন্যবাদ

মহাযান বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায়ের সাধকগণ এই প্রজ্ঞায় পৌঁছেছিলেন যে, বিনয় ব্যবহার মেনে, জপতপ করে অর্হত্বলাভই কাম্য নয়; বন্ধুত্বলাভ করতে হবে। কিন্তু এই লক্ষ্যের মধ্যে নিহিত ছিল বিশ্বমানব কল্যাণ ও মৈত্রী চিন্তা। ‘বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মুক্তি চিন্তাই এই বন্ধুত্ব লাভের প্রধান উদ্দেশ্য। তার জন্য যদি সাধনায় বা বন্ধুত্বলাভের বিঘ্ন ঘটে তাতেও দুঃখ নেই। এই মহাযান সাধকের এই জন্য এই আচার্যদের নিকট মৈত্রীই হল সবচেয়ে বড় চর্যা, আর তাই মৈত্রেয় এসে অধিকার করলেন গৌতম বুদ্ধের স্থান।’<sup>১৩</sup> এই মহাযান ধর্মমতের প্রসার খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকেই। এই মহাযান ধর্মমতের অন্তর্গত বিশিষ্ট দুটি মতবাদ — মাধ্যমিক ও যোগাচার।

মাধ্যমিক বা শূন্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুন। খুব সম্ভব তিনি খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে বিদর্ভে বসবাস করতেন। আচার্য নাগার্জুনের রচিত গ্রন্থগুলি চীনা ও তিব্বতী অনুবাদ থেকে পাওয়া গেছে। গ্রন্থগুলি হল ‘মাধ্যমিক শাস্ত্র’ — ‘বিগ্রহব্যবর্তনী’, ‘প্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্র’ ও ‘মহাযান বিংশক’। এছাড়াও

তিনি রচনা করেছিলেন ‘সুহ্মলেখ’ নামে উপদেশমূলক গ্রন্থটি। পরবর্তীকালে মাধ্যমিক মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন আর্যদেব, চন্দ্রকীর্তি ও শান্তিদেব। আর্যদেব রচনা করেছিলেন ‘শতশাস্ত্র’ ও ‘চতুঃশতক’। চন্দ্রকীর্তি রচনা করেন ‘মধ্যমকাবতার’ ও ‘প্রসঙ্গপদা’। এইসব শাস্ত্র গ্রন্থগুলির মধ্যে মাধ্যমিকবাদ বা শূন্যবাদের বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। খুব সংক্ষেপে মূল কথাগুলি উল্লেখ করা হল।

মাধ্যমিক মতবাদ, বৈভাষিক কিংবা সৌত্রান্তিকদের ‘ভাবস্বভাব’ (positive) ও অভাব স্বভাব (Negative) ধারণাকে গ্রহণ করেনি, তাঁরা একটি মধ্যপথ অবলম্বন করা সম্ভব বলে মনে করলেন। তাঁদের ধারণা মধ্যমা প্রতিপদ বা মধ্যপথ অবলম্বন করাই হচ্ছে বুদ্ধের অনুমোদিত পথ। এই কারণেই এই মতবাদের নাম মাধ্যমিক। ‘নাগার্জুনের মতে পরমার্থ সত্যের আলোচনা করতে গেলে অস্তি-নাস্তি, নিত্য-অনিত্য, আত্মা-অনাত্মা প্রভৃতি অস্তিম বাক্যের কোনোটিই সত্য নয়। পরমার্থ সত্যকে এ দুটির কোনোটি দিয়েই ব্যাখ্যা করা চলে না, কারণ ‘অস্তি বললে বস্তুকে শাস্ত্রত স্বীকার করা হয়, আর নাস্তি বললে সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেওয়া হয়।’<sup>১০০</sup> মাধ্যমিকবাদের মূলসূত্র — ‘শূন্যতা’। (শূন্যতাকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনুবাদ করেছেন নানাভাবে— Vacuity, Non Substance, Universal Relativity) বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণ ধর্মকে তিনি ‘ক্ষণ’ অর্থাৎ ‘উপাদ’, ‘স্থিতি’ ও ‘ভঙ্গ’ — ক্ষণে ভাগ করেছিলেন। নাগার্জুন এই তত্ত্ব অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন ধর্মসমূহকে স্বীকার করে নিলে ‘কাল’-কেও তিন ভাগে ভাগ করতে হয়। যথা— গত, আগত ও গম্যমান (Past, Future, Present), ‘নাগার্জুনের মতে গতিও নেই। যে কাল গত হয়েছে তার কোনো গতি নেই, আগতকাল অর্থাৎ যে কাল আসবে (Future) তার গতির সম্বন্ধে কোনো কথা উঠতে পারে না। সুতরাং কথা উঠতে

পারে গম্যমান বা (Present) সম্বন্ধে। কিন্তু গত ও আগতের কথা বাদ দিলে গম্যমান কালের গতির কথাও ওঠে না। অতএব কাল হচ্ছে গতিহীন।” একইভাবে ধর্মের উৎপাদ, স্থিতি ও ভঙ্গ বলেও কিছুই নেই। হেতু প্রত্যয় দিয়ে জগৎকে বোঝাবার চেষ্টা করা হলে সে জগৎ হবে স্বপ্নের জগৎ।

শূন্যবাদে কারক কর্মকে অস্বীকার করা হয়েছে। এই তত্ত্ব অস্বীকার করতে গিয়ে নাগার্জুন প্রতীত্যসমুৎপাদের উল্লেখ করেছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যয় থেকে (conditions) আভাসের উৎপত্তি হয়। অতএব কারক ও কর্মের ‘সত্যকার উৎপত্তি নাই, আছে শুধু আভাস, আর সে আভাসের অস্তিত্ব ব্যবহারিক বা relative; পরমার্থতঃ এসবের প্রকৃত স্বভাব বলে কিছু নাই, আছে শুধু শূন্যতা। ব্যবহারিক দিক থেকে দেখলে দুঃখ, সংসার, কর্ম, কর্মফল প্রভৃতি সবই আছে, কিন্তু পরমার্থতঃ এই সমস্তই শূন্য। স্বভাব শূন্যতাই হল, একমাত্র সত্যি, আর তা না বুঝলে জগতের প্রকৃত রহস্য ভেদ করা যায় না, নির্বাণলাভ করা ও সম্ভব হয় না। পরমার্থতঃ সংসারের অসংস্কৃত অবস্থা বা স্বভাবশূন্যতাই হল নির্বাণ।

যোগাচারবাদ বা বিজ্ঞানবাদ

বৌদ্ধধর্মদর্শনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ যোগাচারবাদ বা বিজ্ঞানবাদ। বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিকগণ এই মতবাদের প্রবক্তা। বিশেষ করে মৈত্রেয় নাথ, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙনাগ, গুণমতি, স্থিরমতি, ধর্মকীর্তি, শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত, কমলশীল এই মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা রয়েছে — ‘মহাযান সূত্রালঙ্কার’, ‘সম্পরিগ্রহশাস্ত্র’ (অসঙ্গ), ‘অভিসময়ালঙ্কার’ (মৈত্রেয়নাথ), ‘বিংশক-কারিকা-প্রকরণ’, ‘ত্রিংশক-প্রকরণ’, ‘মধ্যান্ত-বিভঙ্গ-শাস্ত্র’ (বসুবন্ধু)।

উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞানবাদ মেনে নিয়েছে মাধ্যমিকবাদের মূল তত্ত্বগুলি। বিজ্ঞানবাদের দার্শনিকগণ স্বীকার করে নিয়েছেন— ‘ধর্মসমূহ অলীক, তাদের উৎপাদ, স্থিতি, বিনাশ প্রভৃতিও অলীক অর্থাৎ সমস্তই হচ্ছে শূন্যগর্ভ।’<sup>১০২</sup> শূন্যবাদীদের মতই তাঁরাও মনে করেন ‘গ্রাহ্য’ (object) ও গ্রাহকের (subject) সংঘর্ষের ফলেই বস্তু সম্বন্ধে অনুভূতি জন্মে।<sup>১০৩</sup> তবে সেই সঙ্গে তারা এও বলেছেন, এই ধর্মগুলি অলীক হলেও প্রকৃতপক্ষে ‘বিজ্ঞানমাত্র’ বা ‘চিন্তামাত্র’। বুদ্ধদেব যে অর্থে বলেছিলেন — ‘চিন্তামাত্রং ভো জিনপুত্রা যদুত ত্রৈধাতুকমিতি অর্থাৎ হে জিনপুত্রগণ ত্রিধাতু বা সমস্ত জগৎ চিন্তামাত্র।’<sup>১০৪</sup> বিজ্ঞানবাদে সেই একই কথা বলেছেন অসঙ্গ। তাঁর অভিমত ‘সমস্তই বিজ্ঞপ্তিমাত্র, তাদের সত্যকার অস্তিত্ব নেই — ‘তৈমিরিক বা চক্ষুপীড়াগ্রস্থ ব্যক্তিদের দৃষ্ট অলীক বস্তুসমূহের মতো অবভাসমাত্র। ধর্ম সমূহ যখন অলীক তখন দেশ এবং কালের পরিচ্ছেদ নেই, কৃত্যক্রিয়ার সমাধান বলেও কিছু নেই, কারণ ধর্মসমূহ প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানমাত্র।’<sup>১০৫</sup> আবার ‘পরমার্থ’ সম্বন্ধেও তাঁরা নাগার্জুনের উত্তরসূরী। তাঁদের অভিমত — ‘পরমার্থ সৎ নয়, অসৎ নয় এবং তার ক্ষয় বৃদ্ধিও নেই। তবে এই পরমার্থ শূন্যমাত্র নয় কারণ এর মধ্যে ধর্ম ধাতু বা idealistic world of phenomenon’<sup>১০৬</sup> রয়েছে। এই ধর্ম ধাতু বা বিজ্ঞানমাত্রতাই পারমার্থিক সত্য।

যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদে আলায় বিজ্ঞান, আলম্বন ও বিষয়-বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। আলায় বিজ্ঞান দু’রকমের — অধ্যাত্ম বা উপাদান বিজ্ঞপ্তি (subjective) এবং বহির্দীর্ঘ (objective) এই আলায় বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে আলম্বন। আলম্বনকে মনোবিজ্ঞানও বলা যায়। কারণ আলম্বন থেকে উদ্ভব হয় — আত্মদৃষ্টি, আত্মমোহ, আত্মমন এবং আত্মস্নেহ। অন্যদিকে বিষয় বিজ্ঞপ্তি ছয় প্রকারের

— রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শনীয় এবং ধর্মাত্মক। বস্তুত বিজ্ঞানবাদের সারকথা — ‘জ্ঞেয় নিরপেক্ষভাবে বিজ্ঞান বা জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্ভব। জ্ঞান বিকারপ্রাপ্ত হলে বিষয় সম্পর্কে ধারণার উৎপত্তি হয়। দ্বৈততা এসে পড়ে। বিজ্ঞানের পরিণাম স্বরূপ জগৎ চরাচর সত্য নয়। এই আরোপিত দ্বৈততা থেকে মুক্ত জ্ঞানই বিশুদ্ধ সৎ বস্তু। বিজ্ঞানমাত্রতাই পারমার্থিক সত্য।’<sup>১০৭</sup>

প্রধান এই চারটি মতবাদ ছাড়াও যথেষ্ট প্রভাব ছিল ‘বহুশ্রুতীয়’, ‘প্রজ্ঞপ্তিবাদ’, ‘চৈতন্যবাদ’, ‘উত্তরশৈল’, ‘অপরশৈল’, ‘মহীশাসক’, ‘কাশ্যপীয়’, ‘ধর্মগুপ্তিক’, ‘সমিতীয়’ ইত্যাদি মতবাদ। বস্তুত, এই বৌদ্ধধর্ম শাখাগুলি আসলে মহাসাঙ্ঘিক ও স্থবিরবাদের অন্তর্গত ছিল।

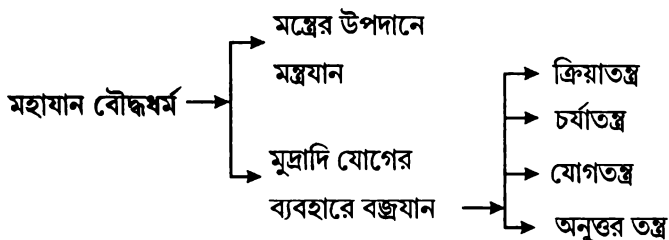
পরবর্তী পাঁচশ বছর ধরে পশ্চিম ভারতে থেরবাদী বৌদ্ধগণ আপন মর্যাদা ও মূল সাধনার ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু মহাযান ধর্মের মধ্যে ক্রমশ আত্মসুখ ও ভোগসম্পৃহা প্রবেশ করে। বিশেষ করে নবম শতক থেকে মহাযান বৌদ্ধধর্মের মধ্যে প্রবলভাবে প্রবেশ করে তন্ত্রসাধনা।

একসময় বিশ্বমানবের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য বুদ্ধত্বলাভের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন মহাযান বৌদ্ধগণ। ‘মহাযান মত সর্বভূতের কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বীয় ধর্মাদর্শকে প্রসারিত করে ক্রমে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের আদর্শ ও আচার অনুষ্ঠানকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছে। সে জন্য অসংখ্য বিসদৃশ ধর্ম বিশ্বাস ও সাধন প্রণালী এবং অসংখ্য দেবদেবী মন্ত্র-তন্ত্র, বিধিনিষেধ তার মধ্যে অল্প দিনেই স্থান লাভ করেছে। কালক্রমে মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যেই দুটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়— পারমিতা নয় ও মন্ত্র নয়। মন্ত্র নয় বা মন্ত্রযান সম্ভবত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বা বজ্রযান কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতি ধর্মমতের পূর্বরূপ।’<sup>১০৮</sup> মহাযান বৌদ্ধধর্মে এই তান্ত্রিকতার প্রবর্তনের জন্য বহু বৌদ্ধ আচার্যের প্রতি দোষারোপ করা

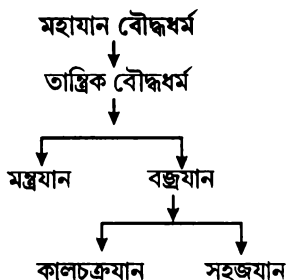


হয়। অনেকের মতে বুদ্ধ নিজেই তাঁর ধর্মকে সাধারণ মানুষের উপযোগী করার জন্য তার মধ্যে মন্ত্র-তন্ত্র, মুদ্রা-মণ্ডল, ঝাড়-ফুক যাদুবিদ্যা প্রভৃতিকে স্থান দিয়েছিল। ‘এই মতের সমর্থনে বুদ্ধের চার ‘ঋদ্ধিতে’ (উচ্চ সাধকগণ কর্তৃক লভ্য অলৌকিক শক্তি) বিশ্বাসের কথা উল্লিখিত হয় এবং তত্ত্বসংগ্রহ ও তার টীকায় লিখিত তন্ত্র মন্ত্র ব্যবহারে বুদ্ধের অনুমতির কথা উল্লিখিত হয়। কিন্তু শুধুমাত্র ঋদ্ধিতে বিশ্বাস যেমন বুদ্ধের তাত্ত্বিকতার প্রমাণ করে না— তেমনি তাঁর তিরোধানের প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পরে লিখিত ‘তত্ত্বসংগ্রহ’-এর বিবরণও নির্ভরযোগ্য নয়। বুদ্ধের সময়ও তাত্ত্বিক আচারের এমনকি মৈথুন সাধন প্রণালীর প্রচলন থাকলেও, যে বুদ্ধদেব বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, তিনি যে শুধু নিজের ধর্মকে সহজ সাধ্য করার জন্য তাত্ত্বিকতার প্রবর্তন করেছিলেন, সে কথা শ্রদ্ধেয় বলে মনে হয় না।”<sup>১১১</sup> তবে মাধ্যমিকবাদের প্রবর্তক নাগার্জুন ও বিজ্ঞানবাদের অন্যতম প্রবর্তক অসঙ্গের সময় বৌদ্ধধর্মে তাত্ত্বিকতার প্রসার ঘটেছিল বলে অনুমান করা হয়। অবশ্য তারও আগে তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল এদেশে। এই প্রসঙ্গে শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন — ‘বৌদ্ধধর্মে তাত্ত্বিকতা প্রবর্তনে অসঙ্গের প্রভাব থাকলেও একথা নিশ্চিত যে, তার আগেই আগম শাস্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল। যাবতীয় তাত্ত্বিকগ্রন্থের মূলে রয়েছে এই আগমশাস্ত্র। সোমানন্দ ও উৎপলের সময়েও এক বিরাট তাত্ত্বিক সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল। এবং তাদের অধিকাংশ সে সময়েরও প্রাচীন ছিল। দশম শতকে রচিত অভিনবগুপ্তের ‘তত্ত্বালোক’ অসংখ্য আগম গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থ সমূহের চিন্তাধারা ও সাধনপ্রণালীর গভীর ঐক্য তাদের উৎসমূলে প্রাচীনতর কোন সাংস্কৃতিক পটভূমিকার পরিচয় দান করেছে।”<sup>১১২</sup> যাইহোক ক্রমশ মহাযান বৌদ্ধধর্ম তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্মে পরিণত হয়। ‘বৌদ্ধধর্মের ক্রমপরিবর্তনের শেষ পর্যায়ে

বৌদ্ধধর্ম তত্ত্বয়ানে বা তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্মে পরিবর্তিত হইয়াছিল। এই সময় কয়েকটি তাত্ত্বিক শাখা গড়িয়া উঠিয়াছিল যথা—মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান প্রভৃতি। ‘এইরূপে গৌতমবুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্মের বহুল পরিবর্তন সাধিত হইয়া কালক্রমে হিন্দুধর্মের দেবতাদিগের ন্যায় বৌদ্ধধর্মেও বৌদ্ধ দেবদেবীর আগমণ ঘটিয়া উহা এক সম্পূর্ণ নূতন ধর্মে পরিণত হইয়াছিল। এই নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান দেবদেবী ছিলেন বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব এবং তাহাদিগের পত্নীগণ। ইহা ব্যতীত পিশাচী, মাতঙ্গী, ডাকিনী, যোগিনী ইত্যাদিরাও তত্ত্বযান শাখায় স্থান করিয়া লইয়াছিল।’” মহাযান বৌদ্ধধর্মের এই বিভাজনকে বিভিন্নভাবে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। তার মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি বিভাজন—



অন্যমতে,



অতএব মহাযান বৌদ্ধধর্ম তার অতীত মহৎ আদর্শ ত্যাগ করে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে পরিণত হতে শুরু করে। মন্ত্র এবং মুদ্রা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এই ধর্মে। বসুবন্ধুর ‘বোধিসত্ত্বভূমি’-তে পরম সত্যকে লাভ করার জন্য মন্ত্রের প্রয়োজন আলোচিত হয়েছে এবং বোধিসত্ত্বের চার প্রকার ধারিণীর কথা বলা হয়েছে।

- ধর্মধারণী মন্ত্রে স্মৃতি-প্রজ্ঞা-বল লাভ হয়।
- অর্থধারণী মন্ত্রে ধর্ম সমূহের প্রকৃত অর্থের দিব্যজ্ঞান হয়।
- মন্ত্রধারণী মন্ত্রে পূর্ণতা লাভ হয়।
- তিতিক্ষা ধারণী মন্ত্রে বক্তার ধর্মের স্বরূপোলঙ্ঘি ও তৎদ্বারা তিতিক্ষা লাভ হয়।

মন্ত্রের সঙ্গে মুদ্রার ব্যবহার ও বৌদ্ধধর্মে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। মুদ্রার অর্থ হস্ত ও অঙ্গুলির বিবিধ সংস্থান। তান্ত্রিক যোগ সাধনায় মন্ত্রের মধ্যে যেমন শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তি — মুদ্রার মধ্যে তেমনই স্পর্শের গুহ্য শক্তি রয়েছে বলা হয়। এছাড়া মণ্ডলের ব্যবহারও বৌদ্ধধর্মে স্থান লাভ করেছিল। ‘বিচিত্র ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্নমুখী প্রবাহ, অসংখ্য দেবতা, উপদেবতা, যক্ষ রক্ষ, ভূতপ্রেত, হটযোগ-রাজযোগ-লয়যোগ-মন্ত্রযোগ প্রভৃতি ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মের উন্মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করে এবং এভাবেই বিনয় ধ্যান প্রধান ভিক্ষুধর্ম ক্রমে বিমিশ্র তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে রূপান্তরিত হয়ে গেল।’<sup>১২</sup> এই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বিভক্ত হয় চারভাগে— ক্রিয়াতন্ত্র, চর্যাতন্ত্র, যোগতন্ত্র ও অনুস্তর তন্ত্র। প্রথম দুটি তন্ত্রে বৌদ্ধদেবদেবীদের পূজাচার নিয়ে রচিত এবং পরের দুটিতে যোগাচারের তত্ত্ব ও তথ্য বর্ণিত হয়েছে — যার উদ্দেশ্য পরমতত্ত্ব লাভ করা।

তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্মের অন্যরকম বিভাজন — বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান। কালচক্রযানের সাধক কালচক্রের গতিবিধি রোধ করতে পারেন। এই ধর্মমত অনুযায়ী — বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সর্বভূত ও সর্বজীবের সংস্থান নিয়ে আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থিত। কালের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাগ, তার দিনরাত্রি, পক্ষমাস, বৎসর নিয়ে দেহের মধ্যে প্রাণবায়ুরূপে বর্তমান। এই দেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কালচক্রযান ধর্মমতে যোগসাধনার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সাধকের প্রাথমিক ও চূড়ান্ত সাধনা ‘প্রাণ’ ও ‘অপ্রাণ’ বায়ু নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রাণবায়ুর সংযম করা।

মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত বজ্রযান অন্যতম তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্ম। এই ধর্মমতে মহাযানের ‘শূন্যতা’-কে ‘বজ্র’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ‘অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ’-এ বলা হয়েছে দৃঢ়তা, সারত্ব, অসৌশীর্ষত্ব, অচ্ছেদ্যাভেদ্য, লক্ষণত্ব, অদাহিত্ব এবং অবিনাশিত্বের জন্য শূন্যতাকেই বজ্র বলা হয়েছে। এই তাত্ত্বিক ধর্মে সমস্ত দেবদেবী ও উপাচারকে বজ্র দ্বারা চিহ্নিত করে তাদের পূর্ব ইতিহাসকে লুপ্ত করা হয়েছে। এই ধর্মমতের প্রধান দেবতা বজ্রসত্ত্ব। উপনিষদের ব্রহ্মের আদর্শে যেন কল্পিত হয়েছেন বজ্রসত্ত্ব। ইনিই পরম সত্যস্বরূপ।

মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত সহজযান বাংলা সাহিত্য সাধনার ধারায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। ‘সহজযানের প্রাচীন শাস্ত্র বেশিরভাগ তিব্বতী অনুবাদে সংরক্ষিত আছে। কয়েকখানি মূলগ্রন্থ নেপাল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে ও প্রকাশিত হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে প্রাচীন বৌদ্ধগানগুলি চর্যাপদ নামে প্রকাশ করেছিলেন সেগুলি সহজপন্থীদের গান।”<sup>১০</sup> সহজযান ধর্মমত, মহাযান বৌদ্ধধর্মের শূন্যতা ও করুণার অভেদ মিলনে বোধিচিন্তের উদ্ভবতত্ত্বকে মেনে নিয়ে সম্যক সম্বোধি লাভের কথা

বলেছিল। তাঁরা এই বিশ্বাসে ঋদ্ধ হয়েছিলেন, শূন্যতা ও করুণার মিলন-ই নারী ও পুরুষ বা প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন। এই মিলনের ফলেই বোধিচিহ্ন বা মহাসুখ লাভ করা সম্ভব। বুদ্ধদেব যে ‘নির্বাণ’-এর কথা বলেছিলেন সহজযান বৌদ্ধধর্মে তা ‘মহাসুখ’-এ পরিবর্তিত হয়।

এই ছিল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখার তত্ত্বগত দিক। কিন্তু তান্ত্রিক সাধকগণ সাধনা করতে গিয়ে তত্ত্বের নামে ইন্দ্রিয় আসক্তিকে এতখানি গুরুত্ব দেন যে ক্রমশ এই ধর্মের বিলয় অনিবার্য হয়ে ওঠে।

### বৌদ্ধধর্মের পরিণতি

সুগত বুদ্ধদেব আত্ম জাগরণের মন্ত্র দিয়েছিলেন। ইন্দ্রিয় সংযম, ব্রহ্ম বিহার, অহিংসা, বিশ্বমানব প্রেম ছিল বৌদ্ধধর্মের মূলকথা। বৌদ্ধধর্মদেশনা নিষ্ঠাসহ পালন ও কল্যাণমিত্র হয়ে ওঠাই ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুর সাধনা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত অন্যতম কারণগুলির জন্য বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে ম্লান হয়ে যায়।

- বৌদ্ধধর্মের বহু বিভাজন।
- কেন্দ্রিয় নেতৃত্বের অভাব।
- বৌদ্ধদেব মধ্যে ভোগ বিলাসিতার প্রাচুর্য।
- বহু দেবদেবীর প্রবেশ ও মূর্তিপূজা।
- সুহৃৎত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান।
- বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতার অবাধ প্রবেশ।
- বৌদ্ধধর্মে গুরুবাদের প্রসার।
- রাজ আনুকূল্যের অভাব।
- বণিক সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের বীতরাগ।
- মুসলমান আক্রমণ।

## বৌদ্ধধর্মের বহু বিভাজন

গৌতমবুদ্ধের মৃত্যুর ১০০ বছরে মধ্যেই শুরু হয়ে যায় দল বিভাজন। মহারাজা কালাশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির দ্বিতীয় অধিবেশনে বিহার জীবনের দশটি আচরণীয় বিধানকে কেন্দ্র করে মহাসাঙ্ঘিকদের সঙ্গে (বৈশালী ও পাটলীপুত্রের বৌদ্ধশ্রমণ) স্থবিরবাদীদের (কৌশাম্বী এবং অবন্তীর বৌদ্ধশ্রমণ) মতান্তর চরমে ওঠে। পরবর্তীকালে থেরবাদীগণ এগারোটি ও মহাসাঙ্ঘিকগণ সাতটি — এই আঠারোটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যান তাঁরা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থবিরবাদ, হৈমবত, ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সবাস্তিবাদ, সন্নির্তীয়, মহাসাঙ্ঘিক, লোকোত্তরবাদ, বহুশ্রুতীয়, প্রজ্ঞাপ্তিবাদ, চৈত্যবাদ, উত্তরশৈল, অপরশৈল ইত্যাদি। তবে বৌদ্ধধর্মের এইসব মতবাদ এই ধর্মের মূলদর্শন থেকে খুব একটা দূরে সরে আসেনি। খ্রিস্টীয় প্রথম শতক থেকে পঞ্চম শতক পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন দার্শনিক অভিপ্ৰায়ের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে চারটি সম্প্রদায় — বৈভাষিক, সৌত্রাঙ্ঘিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার। কিন্তু পরবর্তী ৫০০ বছর ধরে মহাযান বৌদ্ধধর্ম, বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ধর্ম দর্শন থেকে সরে আসে। এই ধর্মে প্রবলভাবে প্রবেশ করে তত্ত্বসাধনা। মহাযান ধর্ম প্রধান দু'টি ভাগে বিভক্ত হয় — মন্ত্রযান ও বজ্রযান। বজ্রযানের আবার দু'টি ভাগ — কালচক্রযান ও সহজযান। এই বহু বিভাজনের শেষের স্তরগুলিতে বৌদ্ধধর্মের 'শীল', অনুশীলন', 'মার্গপালন'-এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ফলে বৌদ্ধধর্ম উদার মানবধর্ম থেকে আত্মসুখ ও ইন্দ্রিয় সর্বস্ব তাত্ত্বিকধর্মে পরিণত হয়।

## কেন্দ্রিয় নেতৃত্বের অভাব

করুণাময় বুদ্ধদেব যতদিন জীবিত ছিলেন, তাঁর সৌম্য স্নিগ্ধ চোখের আলোয় সবাই আলোকিত হয়েছিল। দেবদত্তের মত দু'-একজন বিরোধিতা

করতে চাইলেও তাঁর সীমাহীন করুণায় ও নেতৃত্বের গুণে মুগ্ধ হয়েছিলেন রাজা-মহরাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক ও সাধারণ মানুষ। মহারাজা অশোকের সময় তাঁর সুনিয়ন্ত্রণ ও সামর্থ্যের শৃঙ্খলায় দেশ ছাড়িয়ে বহির্ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধর্মের প্রসার ঘটেছিল। আবার মহারাজা কনিষ্কের সময় দার্শনিক পার্শ্বের সভাপতিত্বে চতুর্থ মহাসঙ্গীতিতে একত্রিত হয়েছিলেন বৌদ্ধগণ। কিন্তু এরপর যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে কোনো মহাসঙ্গীতির সম্মেলন হয়নি। এই ধর্মের এক একটি শাখায় বহু বিখ্যাত দার্শনিকদের আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু অখণ্ড বৌদ্ধধর্মকে সুসংগঠিত রাখার কোনো প্রচেষ্টা ছিল না।

বৌদ্ধদের মধ্যে বিলাসিতার প্রবেশ

বৌদ্ধধর্মের মূলকথা শীলসাধনা ও মৈত্রীভাবনা। ‘চার আর্যসত্য’ অনুভব করে অষ্টাঙ্গিক মার্গপালন ও শীলপালনের মধ্যে দিয়ে বৌদ্ধ সাধককে একনিষ্ঠ হতে হয়। কিন্তু ক্রমশ এই ধর্মে প্রবেশ করে আত্মসুখ ও বিলাসিতা। মহারাজ কালাশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির দ্বিতীয় অধিবেশনে বিহার জীবনের দশটি আচরণীয় বিধানকে কেন্দ্র করে এই বিলাস জীবনের সূচনা হয়। বুদ্ধের নির্দেশ অমান্য করে একদল ভিক্ষু অভিমত দেন —

- লবণ সঞ্চয় করা যায় বা করা প্রয়োজন।
- দুপুর ১২টার পর প্রয়োজনে ভোজন করা যায়।
- দু’বার খাওয়ার দোষ নেই।
- একত্রে উপবাস করা যাবে।
- একসঙ্গে সন্ধ্যের কাজ করা যাবে।
- গুরুবাক্য পালন করা যাবে।
- দই বা ঘোল খাওয়া।
- রস সেবন বা মদ পান। তবে রস গাঁজিয়ে ওঠার আগে খেতে হবে।

- আসন গ্রহণ করা।
- সোনা রূপা দান হিসেবে গ্রহণ করা।

এই ‘দশবস্তু’ গ্রহণের মধ্যে বিলাসিতার বীজ লুকিয়ে আছে। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। মহাযান বৌদ্ধধর্মে ক্রমশ শীলপালনেও শিথিলতা দেখা যায়। এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিহারগুলিতে প্রাচুর্যে ভরে যায়। আর্থিক স্বচ্ছলতার অন্তরালে জন্ম নেয় শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতা। আরও পরে বহু বৌদ্ধ বিহার আত্মসুখের আখড়ায় পরিণত হয়। যে জীবন ছিল ত্যাগের, কল্যাণের ও মৈত্রীর—সেই জীবন হয়ে উঠেছিল বাসনাময় ইন্দ্রিয়সুখের।

### তান্ত্রিকতার অবাধ প্রবেশ

বৌদ্ধধর্ম ক্রমপরিবর্তনের শেষ পর্যায়ে তন্ত্রযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে পরিণত হয়েছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান বৌদ্ধধর্মে প্রবলভাবে প্রবেশ করে তন্ত্রের নামে লোকাচার, অসংযম ও সহজ ইন্দ্রিয় সুখের অনুষঙ্গ। তন্ত্রাচারের সমর্থনে রচিত হয়েছিল ‘গুহ্যসমাজ’ বা ‘তথাগতগুহ্যক’, ‘চণ্ডমহারোচন তন্ত্র’, ‘ডকিনী জাল’, ‘সম্বর তন্ত্র’, ‘হে বজ্রতন্ত্র’, ‘সম্পূটতন্ত্র’, ‘চতুষ্টয়োগিনী সম্পূট’, ‘গুহ্য বজ্র’-এর মত তন্ত্রগ্রন্থগুলি। সেই সঙ্গে শম্বর জাতীয় এমন সব অশ্লীল দেবমূর্তি বৌদ্ধদের উপাস্য হয়ে উঠেছিল—যার ফলে সাধারণ সংস্কৃতি মনস্ক গৃহী সমাজ এইসব বৌদ্ধদের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছিলেন—‘সে সকল উপাসনার প্রকার আরও অশ্লীল— সভ্য সমাজে বর্ণনা করা যায় না। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন; বৌদ্ধদের এই সকল পুঁথি ঘোমটা দেওয়া কামশাস্ত্র। আমি বলি তিনি ইহা ঠিক বর্ণনা করিতে পারেন নাই। যেখানে কামশাস্ত্রের শেষ হয়, সেখানে বুদ্ধদিগের গুহ্যপূজার আরম্ভ। অধিক



পুঁথির নাম করিব না। গৃহ্য সমাজ বা তথাগত গৃহ্যক নামে বৌদ্ধদের একখানি পুঁথি আছে। এই পুস্তক সম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছেন—  
but in working in out, theorous are indulged in, and practices enjoined which are at once ‘The most revolting and horrible, that humane depravity could think of and compared to which the worst. Specimens of Holiwell Street Literature of the last century would appear absolutely pure.’” এইসব তাত্ত্বিকদের খাদ্যাভাসে যেমন কুরুচির পরিচয় মেলে তেমনি সিদ্ধিলাভের জন্য এদের কাছে পালনীয় ছিল সমস্ত রকমের কামনা-বাসনা তৃপ্তি করা। গৃহ্য সমাজতন্ত্রে বলা হয়েছে —

‘দুষ্কবৈর্নিয়মেস্তীত্রৈঃ সেব্যমানো ন সিদ্ধতি।

সর্বকামোপভোগৈশ্চ সেব্যং চাশু সিদ্ধতি ॥

অর্থাৎ দুষ্কর কঠোর নিয়ম করিয়া সেবা করিলে কিছুতেই সিদ্ধিলাভ হয় না — সর্বপ্রকার কামোপভোগ করিয়া যদি সেবা করো - তাহা হইলে নিশ্চয় শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হইবে।” কীভাবে এই কাম উপভোগ করবে — তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছিল এই গ্রন্থগুলিতে। একটি উদাহরণ দিলে আরও স্পষ্ট হবে এই ধারণা

‘দ্বাদশাব্দিকং কন্যাং চণ্ডালস্য মহাত্মনঃ।

সেব্যেৎ সাধকো নিত্যং বিজনেষু বিশেষতঃ ॥

অর্থাৎ কোনো সদাশয় চণ্ডালের বারো বছরের কন্যাকে সাধক বিশেষ নির্জনে সেবা (অর্থাৎ পরিচর্যা) করবে।” তদ্বশাস্ত্র গ্রন্থগুলি এইভাবে বৌদ্ধদের অনাচারে স্বীকৃতি দেওয়ায় আর কোনো বাধা ছিল না ভোগবাসনায়। এর অনিবার্য প্রভাব পড়েছিল বৌদ্ধধর্মের উপরে। ভারতীয় তথা বাংলার বৃহত্তর সমাজে প্রকৃত ভিক্ষুর সংখ্যা কমে গিয়ে গৃহস্থ ভিক্ষুদের সংখ্যা বেড়ে

যায়। এইসব ভিক্ষুগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিরত হয়ে সহজ সাধন প্রণালীর আশ্রয় নেন। ‘প্রজ্ঞাপারমিতা’, ‘গণ্ডব্যূহসূত্র’, ‘মহাপ্রতিসরা’— এই মহাগ্রন্থগুলি পাঠ করলে সাধকের যে ফললাভ সম্ভব, তার সমান সিদ্ধি হবে বলে মনে করেছিলেন এক একটি ‘ধারণী’ মস্ত্রে। ক্রমশ সেই মস্ত্রের আকার সংক্ষিপ্ততর হতে হতে ‘হুংফট স্বাহা’-য় পরিণত হয়। সব মিলিয়ে ক্রমশ প্রায় সব স্তরের বৌদ্ধদের মধ্যে দেহসুখের বাসনা ও বিলাসিতার আকাঙ্ক্ষা তাঁদের ব্যভিচারী করে তোলে। ভারতীয় জনমানস এই ধর্মের উপর ভরসা রাখতে পারে না। ফলে নবম-দশম শতক থেকে এই ধর্মের দ্রুত অবক্ষয় ঘটে।

**মূর্তিপূজা :** বৌদ্ধ আঙিনায় বহু দেবদেবীর প্রবেশ

উত্তর বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার সর্বস্বতা ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সুগত বুদ্ধদেব আত্মজাগরণের মন্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মানবপ্রেম ও কল্যাণের জন্য বলেছিলেন — “আত্মদীপ ভব”। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পাঁচশ বছরের মধ্যে এই ধর্মে মূর্তিপূজার বহুল প্রচলন শুরু হয়। প্রথম দিকে অসংখ্য বুদ্ধমূর্তিতে পূজার অর্ঘ্য দেওয়া হয়; পরে দেবাসনে আবির্ভূত হন ধ্যানীবুদ্ধ — অমিতাভ, অশোকভা, বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমোঘসিদ্ধি। এরপর ধ্যানীবুদ্ধদের শক্তিরূপে আসেন — লোচনা, মামকী, তারা, আর্যতারিকা। এঁদের মিলনে জন্ম নেয় বোধিসত্ত্ব সমস্ত ভদ্র, অক্ষয়মতি, ক্ষিতিগর্ভ, রত্নপানি, বজ্রগর্ভ, অবলোকিতেশ্বর, চন্দ্রপ্রভ, অমিত প্রভ, মৈত্রেয়, মঞ্জুশ্রী, জ্ঞানকেতু, ভদ্রপাল, অমোঘদর্শী, সুরঙ্গম, বজ্রপানি প্রভৃতি দেবতার। এইভাবে উপাস্য দেবদেবীতেভরে ওঠে বৌদ্ধ দেব-আঙিনা। কিন্তু এরপর তদ্ব্যমতে সাধনা করতে গিয়ে ধ্যানীবুদ্ধদের অনুকরণে বৌদ্ধসাধকদেরও প্রয়োজন হয় সাধন সঙ্গিনীর। সাধনতন্ত্র গ্রন্থগুলির নিয়মানুসারে তাঁরা

বোধিসত্ত্বলাভের জন্য সঙ্গিনীসহ সমারোহে নানা উপাচারে সাধনার নামে স্বেচ্ছাচার করতে শুরু করে। তাঁদের উপাস্য হয়ে ওঠে শক্তির পাঁচ সঙ্গিনীরা — ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, যক্ষিণী ও ভৈরবী। এদের যে মূর্তি তৈরি হয় তা অত্যন্ত নগ্ন ও অশ্লীল। ‘এই সকল মূর্তির নাম উহারা বলিত শম্বর। একে তো অশ্লীল মূর্তি, তাহাতে ভালো কারিগরের হাতে তৈয়ারি — তাহাতে অশ্লীলতার মাত্রা চড়িয়া গিয়াছে। সেই সকল মূর্তি যখন বৌদ্ধদের প্রধান উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল — তখন আর অধঃপাতের বাকি রহিল কী? সে সকল উপাসনার প্রকার আরও আশ্লীল — সভ্য সমাজে বর্ণনা করা যায় না।’<sup>১১</sup> সেই সঙ্গে এই ধর্মে শুরু হয় গোপনীয় গুহ্যপূজা। বৌদ্ধগ্রন্থ ‘সাধনমালা’-এর বিচিত্র সাধন প্রণালী রয়েছে। বিশেষ করে ‘তথাগত গুহ্যক’-এ আচার পালনের যে আদিরসাত্মক বর্ণনা রয়েছে — তা পালন করলে স্বাভাবিকভাবেই একটি ধর্ম সম্প্রদায় বা সম্মুখ সমাজ অচিরেই অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। তান্ত্রিক বৌদ্ধ ও তাদের অনুসারীদের ক্ষেত্রে সেই পরিণতি ঘটেছিল।

### সুসংহত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান

একদা বৌদ্ধধর্মের বাণী আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের গৃহে, পথ-প্রান্তরে ধ্বনিত হয়েছিল। মহারাজা অশোকের সময় ভারতবর্ষের বাইরে বিস্তারলাভ করেছিল এই ধর্ম। তবে গুপ্ত রাজাদের সময় আবার ‘পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের’ পুনরুত্থান হয়েছিল। ফলে প্রধান দুই ধর্ম তাদের নিজস্ব জ্ঞানচর্চা সাধনা নিয়ে বর্তমান ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের বিচিত্র বিভাজন ও তান্ত্রিকতার প্রবেশ এই ধর্মকে ক্রমশ ম্লান করে দিয়েছে। পাল যুগে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম হওয়ায় বৌদ্ধধর্মের বিহার কেন্দ্রিক শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু পালযুগের অবসানের পর সেন ও বর্মণ বংশের রাজাগণ চরম বৌদ্ধ

বিরোধী ছিলেন এবং নব্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারে তৎপর হওয়ার ভারতীয় তথা বাংলার ধর্মীয় চরিত্র ক্রমশ পাল্টে যায়। ইতিমধ্যে পরমঞ্জ্ঞানী শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবে হিন্দুধর্মের ছায়ায় আসতে শুরু করেছিলেন প্রতিবাদী ধর্মের মানুষ। সেই সঙ্গে বর্মণ রাজা হরিবর্মা দেবের মন্ত্রী স্মার্ত ভবদেব ভট্ট সামাজিক অনুশাসনে বাঁধতে চেষ্টা করেছিলেন সমাজকে। হিন্দু সমাজে এরপর একে একে কুমারিল ভট্ট, জীমূতবাহন, শূলপানি, অনিরুদ্ধ ভট্ট, গুণবিশু, হলায়ুধ, ঈশান, পশুপতি প্রমুখ স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণ অনুশাসনে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। সেই সঙ্গে ‘মনুসংহিতা’-র মত গ্রন্থগুলির দ্বারা সমাজ নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু হয়েছিল। এই সময় কোনো বিশেষ বিরোধিতা হয়নি। কারণ বৌদ্ধধর্মে নেতৃত্ব দেওয়ার মত প্রায় কেউ-ই ছিল না বা থাকলে বৌদ্ধ সমাজ তাত্ত্বিকতার কারণে এত অঙ্ককারে প্রবেশ করেছিল যে, তাদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব ছিল না। সেই পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শিকড় ক্রমশ সমাজের গভীরে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁর ‘ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধ্বংস’<sup>১১৮</sup> প্রবন্ধে ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণের অত্যাচারতা ও অনুদারতাকে বৌদ্ধধর্ম ধ্বংসের অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর দেওয়া তথ্যগুলি উল্লেখ করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে —

- খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী ন্যায়কর্তিকপ্রণেতা উদ্যোতকরাচার্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দিঙনাগাদি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণকে আক্রমণ করেন।
- খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কুমারিল ভট্ট দক্ষিণাপথে আবির্ভূত হইয়া বৌদ্ধধর্মের নিবাকরণ ও বৈদিকধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার ‘মীমাংসাবার্তিক’ এই পাঠ করলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় তিনি

কিরূপ অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন। তিনি বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থসমূহকে অশাস্ত্র বলিয়া অবধারণ করেন। মাধবাচার্যকৃত ‘সংক্ষেপশঙ্করজয়’ গ্রন্থে লিখিত আছে, পুরাকালে কুমার (কার্ত্তিকেয়) যেরূপ অসুরকুল নির্মূল করিয়াছিলেন সেইরূপ বৈদিক কর্মপরাস্থখ বৌদ্ধগণকে নিহত করিবার নিমিত্ত তিনিই আবার কুমারিল ভট্টরূপে অবতীর্ণ হন। বৌদ্ধগণ জগৎ আক্রমণ করিলে বৈদিকধর্ম বিলুপ্ত প্রায় হইয়া পড়ে। বেদমার্গের রক্ষা ও বৌদ্ধগণের পরাজয় সাধন করিবার নিমিত্ত যে সকল পণ্ডিত অগ্রসর হন তন্মধ্যে কুমারিল ভট্ট সর্বপ্রথম।

- খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সুবিখ্যাত শঙ্করাচার্য দক্ষিণাপথে অবতীর্ণ হইয়া অসাধারণ কৌশলের বলে বৌদ্ধদিগকে নিরস্ত করেন। তিনি স্বীয় বেদান্তভাষ্যের ১/২/৩২ স্থলে লিখিয়াছেন একমাত্র বুদ্ধদেব বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা অথচ বৌদ্ধ সম্প্রদায় মধ্যে বাহ্যার্যবাদ ও শূন্যবাদ এই তিনটি পরস্পর বিরুদ্ধমত দৃষ্ট হয়।
- খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আনন্দগিরির স্বীয় বেদান্ত টীকার ২/২/৩ স্থলে লিখিয়াছেন ইতিহাস পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয় ভগবান বাসুদেব স্বয়ংই বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ... যে সকল লোক বৈদিক মার্গ পরিত্যাগ করে তাহারা পশু। সেই পশুদিগের প্রতি বিদ্বেষ বলিতে এবং তাহাদিগকে বিমূঢ় করিবার জন্য ভগবান বাসুদেব বুদ্ধরূপেও অবতীর্ণ হইয়া তিনটি পরস্পর বিরুদ্ধ মতের সৃষ্টি করেন।
- খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বাচস্পতি মিশ্র ‘ন্যায়কর্ত্তিক তাৎপর্যটিকা’-য় ২/১/৬৮ স্থলে লিখিয়াছেন সর্বজ্ঞ জগৎকর্তা পরমেশ্বর কর্তৃক বেদ বিরচিত হইয়াছে এবং মনু প্রভৃতি ঋষিগণ উহার মত অবলম্বন

বিরোধী ছিলেন এবং নব্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারে তৎপর হওয়ার ভারতীয় তথা বাংলার ধর্মীয় চরিত্র ক্রমশ পাল্টে যায়। ইতিমধ্যে পরমঞ্জ্ঞানী শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবে হিন্দুধর্মের ছায়ায় আসতে শুরু করেছিলেন প্রতিবাদী ধর্মের মানুষ। সেই সঙ্গে বর্মণ রাজা হরিবর্মা দেবের মন্ত্রী স্মার্ত ভবদেব ভট্ট সামাজিক অনুশাসনে বাঁধতে চেষ্টা করেছিলেন সমাজকে। হিন্দু সমাজে এরপর একে একে কুমারিল ভট্ট, জীমূতবাহন, শূলপানি, অনিরুদ্ধ ভট্ট, গুণবিশু, হলায়ুধ, ঈশান, পশুপতি প্রমুখ স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণ অনুশাসনে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। সেই সঙ্গে ‘মনুসংহিতা’-র মত গ্রন্থগুলির দ্বারা সমাজ নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু হয়েছিল। এই সময় কোনো বিশেষ বিরোধিতা হয়নি। কারণ বৌদ্ধধর্মে নেতৃত্ব দেওয়ার মত প্রায় কেউ-ই ছিল না বা থাকলে বৌদ্ধ সমাজ তাত্ত্বিকতার কারণে এত অন্ধকারে প্রবেশ করেছিল যে, তাদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব ছিল না। সেই পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শিকড় ক্রমশ সমাজের গভীরে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁর ‘ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধ্বংস’<sup>১১৮</sup> প্রবন্ধে ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণের অত্যাচারতা ও অনুদারতাকে বৌদ্ধধর্ম ধ্বংসের অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর দেওয়া তথ্যগুলি উল্লেখ করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে —

- খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী ন্যায়কর্তিকপ্রণেতা উদ্যোতকরাচার্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দিঙনাগাদি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণকে আক্রমণ করেন।
- খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কুমারিল ভট্ট দক্ষিণাপথে আবির্ভূত হইয়া বৌদ্ধধর্মের নিবাকরণ ও বৈদিকধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার ‘মীমাংসাবার্তিক’ এই পাঠ করলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় তিনি

কিরূপ অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন। তিনি বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থসমূহকে অশাস্ত্র বলিয়া অবধারণ করেন। মাধবাচার্যকৃত ‘সংক্ষেপশঙ্করজয়’ গ্রন্থে লিখিত আছে, পুরাকালে কুমার (কার্ত্তিকেয়) যেরূপ অসুরকুল নির্মূল করিয়াছিলেন সেইরূপ বৈদিক কর্মপরাঙ্খ বৌদ্ধগণকে নিহত করিবার নিমিত্ত তিনিই আবার কুমারিল ভট্টরূপে অবতীর্ণ হন। বৌদ্ধগণ জগৎ আক্রমণ করিলে বৈদিকধর্ম বিলুপ্ত প্রায় হইয়া পড়ে। বেদমার্গের রক্ষা ও বৌদ্ধগণের পরাজয় সাধন করিবার নিমিত্ত যে সকল পণ্ডিত অগ্রসর হন তন্মধ্যে কুমারিল ভট্ট সর্বপ্রথম।

- খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সুবিখ্যাত শঙ্করাচার্য দক্ষিণাপথে অবতীর্ণ হইয়া অসাধারণ কৌশলের বলে বৌদ্ধদিগকে নিরস্ত করেন। তিনি স্বীয় বেদান্তভাষ্যের ১/২/৩২ স্থলে লিখিয়াছেন একমাত্র বুদ্ধদেব বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা অথচ বৌদ্ধ সম্প্রদায় মধ্যে বাহ্যার্যবাদ ও শূন্যবাদ এই তিনটি পরস্পর বিরুদ্ধমত দৃষ্ট হয়।
- খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আনন্দগিরির স্বীয় বেদান্ত টীকার ২/২/৩ স্থলে লিখিয়াছেন ইতিহাস পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয় ভগবান বাসুদেব স্বয়ংই বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ... যে সকল লোক বৈদিক মার্গ পরিত্যাগ করে তাহারা পশু। সেই পশুদিগের প্রতি বিদ্বেষ বলিতে এবং তাহাদিগকে বিমূঢ় করিবার জন্য ভগবান বাসুদেব বুদ্ধরূপেও অবতীর্ণ হইয়া তিনটি পরস্পর বিরুদ্ধ মতের সৃষ্টি করেন।
- খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বাচস্পতি মিশ্র ‘ন্যায়কর্ষিক তাৎপর্যটীকা’-য় ২/১/৬৮ স্থলে লিখিয়াছেন সর্বজ্ঞ জগৎকর্তা পরমেশ্বর কর্তৃক বেদ বিরচিত হইয়াছে এবং মনু প্রভৃতি ঋষিগণ উহার মত অবলম্বন

করিয়েছেন। সুতরাং বেদকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। বৌদ্ধগণ স্বয়ং বলিয়া থাকেন তাঁহাদের শাস্ত্র বুদ্ধদেবের উদ্ভাবিত, বুদ্ধ কিছু সর্বজ্ঞ ছিলেন না এবং তিনি পৃথিবীর কর্তাও নহেন। কতগুলি পশুপ্রায় লোক তাঁহাদের শাস্ত্রের মত গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং বৌদ্ধশাস্ত্রকে কোনো প্রকারেই আপ্তবাক্য বলিতে পারা যায় না।

- দ্বাদশ শতাব্দীতে উদয়নাচার্য মিথিলা প্রদেশে আবির্ভূত হইয়া ন্যায়কর্ত্তিক তাৎপর্য্যটিকা — পরিশুদ্ধি, কুসুমাঞ্জলি ও আত্মতত্ত্ববিবেক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আত্মতত্ত্ববিবেকের অপর নাম বৌদ্ধাধিকার। কেহ কেহ ইহাকে বৌদ্ধ দ্বিকার ও বলিয়া থাকেন। এই গ্রন্থে উদয়ন সমস্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।
- জয়ন্তস্বামী ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে বৌদ্ধমত খণ্ডন করে লিখেছিলেন — বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন কোন নিত্য আত্মা নাই অথচ তাঁহারা মরণান্তর স্বর্গলাভ হইবে, এই আশা করিয়া চৈত্য পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন সমস্তই শূন্য অথচ গুরুকে ধন দান করিবার উপদেশ প্রদান করেন। বৌদ্ধগণের চরিত্রের বিষয় আর কি বলিব, তাহার কেবল দন্তের আধার।
- খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণাপথে রামানুজ জন্মগ্রহণ করেন। ‘রামানুজ বৈষ্ণবধর্মের সৃষ্টি করিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মূলে কুঠারাঘাত করেন। এই সময় হইতে ভুরি ভুরি বৌদ্ধ স্বধর্মত্যাগ করে।
- চতুর্দশ শতাব্দীতে মাধবচার্য, শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরি মঠের প্রধান আচার্যপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি স্মার্ত ও বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের অনেক উন্নতিসাধন করিয়া বৌদ্ধগণকে সম্পূর্ণ নির্মূল করেন।



- ব্রাহ্মণ দার্শনিক বৌদ্ধমতের অসারতা প্রতিপাদন করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই। তাহারা অত্যাচারতা প্রকাশপূর্বক বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই তিনকেই সুসংস্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। পৌরাণিকগণ বুদ্ধকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার মध्ये পরিগণিত করেন। শঙ্করাচার্য বুদ্ধের মায়াবাদকে অদ্বৈতবাদ নাম দিয়া সর্বত্র প্রচারিত করেন। বুদ্ধের প্রবর্তিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের অনুকরণে রামানুজ, মাধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ বৈরাগী ও বৈরাগিনী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন।
- যখন বুদ্ধদেব বিষ্ণু হইলেন, শূন্যবাদ ব্রহ্মবাদে পরিণত হইল এবং ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ স্বীয় উপাধি ত্যাগ করিলেন, তখন বৌদ্ধধর্মের কিছুই অবশিষ্ট থাকিল না। ক্রমে বৌদ্ধগণ বৈষ্ণব ও শৈব হইলেন।
- ব্রাহ্মণগণ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সহায়তা করিয়া বৌদ্ধধর্মের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিবার উপায় আরও সহজ করিলেন। বৌদ্ধগণ তান্ত্রিক ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মে পুরনোগমণ করিতে লাগিলেন। সমগ্র বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে তান্ত্রিক ধর্মে পরিণত হইল এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ পরিশেষে হিন্দু হইলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম এতদুভয়ের সমবায়ে বর্তমান হিন্দুধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুগণ বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম স্বীয় ধর্মে গ্রহণ করিয়া যে অত্যাচারতা প্রকাশ করিয়াছিল তাহারই ফলে ভারত হইতে বৌদ্ধ এই নাম বিলুপ্ত হইয়াছে।

অতএব সচেতনভাবে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ক্রমশ প্রবলভাবে গ্রাস করেছিল বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে।

## গুরুবাদের প্রসার

বৌদ্ধধর্মে গুরুবাদ অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল। এবং শেষ পর্যন্ত এই ধর্মকে চূড়ান্ত অন্ধকারে পথে নিয়ে গিয়েছিল এই গুরুবাদই। প্রকৃতপক্ষে এই ধর্মই গুরুবাদের প্রসার ঘটিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম দেববাদ নির্ভর ধর্ম। শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছিলেন — ‘খাঁটি ধর্ম দু’রকম ছাড়া তিন রকম হইতে পারে না। সেই দুই প্রকার ধর্ম ১. দেবভাজু ২. গুভাজু। হয় দেবতাকে ভজনা করো, না হয় গুরুকে ভজনা করো। ব্রাহ্মণেরা দেবভাজু, বৌদ্ধেরা গুভাজু, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কিছুতেই মিশিতে পারে না। বৌদ্ধধর্মের শ্রাবকযান ও প্রত্যেকযান দুই-ই গুভাজু-তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাযানও সম্পূর্ণরূপে গুভাজু।’” এই ধর্মে গুরু একসময় ছিলেন কল্যাণমিত্র। ক্রমে সেই গুরুই হয়ে উঠেছিলেন পঞ্চ ‘ম’-কারের উপাসক।

গুরুই হলেন একমাত্র অবলম্বন। অতএব গুরুবাক্যই গ্রহণীয় ও পালনীয় হয়ে উঠল ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের, এমনকি গৃহী বৌদ্ধদের কাছে। এই গুরুগণ নির্দেশ দিলেন, ভোগ করো, প্রাণ ভরে ভোগ করো, দেহকে কষ্ট দিয়ে কোন সাধনা করার প্রয়োজন নেই। ‘সিদ্ধার্চ্যগণ ও তাহাদের চেলারা দেশের একরূপ কর্তা ছিলেন। একে তো তাহাদের ধর্ম অতি সহজ, মানুষে যাহা চায় তাই তাহারা দিতেন। তাহাও আবার বজ্রুতার ছটায় নয়, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নয়, সংস্কৃতির ব্যাখ্যায় নয়, উপদেশ দিয়া নয়। গানে, নানা সুরে, নানা বাক্যের সঙ্গে গান করিয়া তাহারা লোকেদের বলিয়া দিতেন, বাপু হে সবই তো শূন্য — সংসারও শূন্য, নির্বাণও শূন্য — তবে যে আমি আমি করিয়া বেড়াই, এটা কেবল ধোকামাত্র।

এই ধোকার পশরা নামাইয়া ফেলো। তখন দেখিবে কিছুই কিছু নয়। সুতরাং আনন্দ করো। আনন্দই শেষ থাকিবে। আদিতেও আনন্দ, মধ্যেও

আনন্দ, শেষেও আনন্দ।”<sup>২০</sup> দেহসুখের মধ্যে সেই আনন্দ খুঁজে নিতে চেয়েছিল বৌদ্ধগণ। আর যতই তাঁরা অনাচারে ডুবেছে, ততই রুচিশীল মানুষ এই ধর্মের প্রতি বীতরাগ হয়েছে। পাল রাজাদের আমলে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম হওয়ায় তত্ত্বনির্ভর এই ধর্মের উপর প্রশাসনিক শিথিলতা ছিল। ফলে নির্বিঘ্নে গুরুগণ তাঁদের অনাচার বাড়িয়েছিলেন। সেন আমলে রাজরোষে এই গুরুগণই অন্ত্যজ লোকসাধারণের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে সমাজদেহকে যথেষ্ট কলুষিত করেছিল।

রাজ আনুকূল্যের অভাব

বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল রাজ-আনুকূল্যে বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই। মহারাজা বিন্ধিসার, অজাতশত্রু, প্রসেনজিৎ, চণ্ড, প্রদ্যোত, রাজা উদয়ন, রাজা পুষ্কর সারিনি, রুদ্দায়ন প্রমুখ মহারাজাদের সহায়তায় এই ধর্মের ব্যপ্তি শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে লিচ্ছবি, মল্ল, কোলিয়, বুলি রাজবংশের ছোটো ছোটো রাজাগণ এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। আরও পরে মৌর্যরাজা অশোক বৌদ্ধধর্মকে বিশ্বমানবধর্মের মর্যাদা দিয়ে বহিঃভারতে এই ধর্ম প্রচারের ও প্রসারের ব্যবস্থা করেছিলেন। গ্রীক রাজাগণ (বিশেষ করে মিলিন্দ) ও কুষাণ রাজা কনিষ্ক এই ধর্মের প্রসারে ঐকান্তিক ছিলেন। কনিষ্কের সহায়তায় চতুর্থ ও শেষ মহাসঙ্ঘীতি সম্পন্ন হয়। গুপ্ত রাজাগণ হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও তাঁরা ছিলেন পরমধর্মসহিষ্ণু। বৌদ্ধ এবং হিন্দু ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বিকাশ ঘটেছিল গুপ্তযুগেই। সর্বোপরি মহারাজ হর্ষবর্ধন ও পালরাজাগণ বৌদ্ধধর্মের প্রতি পরিপূর্ণরূপে অনুগত ছিলেন। ‘পাল রাজারা বৌদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের পোষক ছিলেন। গোপালদেব ওদন্তপুরের বিহার স্থাপন করেন। বিক্রমশিলা বিহার ধর্মপাল তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে স্থাপনা করেছিলেন। তাঁর পুত্র দেবপালের সময় বজ্রযানপন্থী বৌদ্ধদের

সেখানে কেন্দ্র ছিল এবং দেবপাল স্বয়ং এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতেন। জগদল বিহারের স্থাপনা করেন রামপাল। দেবপালের সময় যবদ্বীপের রাজা শ্রীবালপুত্রদেব আনুমানিক ৮৫৮ খৃষ্টাব্দে দেবপালের নিকট দূত পাঠিয়ে রাজগীরে গয়া অঞ্চলে পাঁচটি গ্রাম ক্রয় করেছিলেন এবং গ্রামগুলির রাজস্ব নালন্দা বিহারের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য দান করেন।<sup>২১</sup> অতএব এবিষয় স্পষ্ট যে, রাজ আনুকূল্য এই ধর্মের প্রসারে ও নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু শুঙ্গ রাজা পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সময় থেকে বৌদ্ধদের প্রতি রাজ-রোষ শুরু হয়। ব্যক্তিগতভাবে পুষ্যমিত্র বৌদ্ধদের ঘোরতর শত্রু ছিলেন। পরবর্তীকালে রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেন ও বর্মণ রাজাগণ ‘নব্যব্রাহ্মণ্যবাদ’-কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বৌদ্ধদের প্রবল উপেক্ষায় যথেষ্ট সংকট দেখা দেয়। সাধারণ গৃহীদের অবস্থা আরও করুণ হয়ে ওঠে। ফলে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ আরও অন্ধকারে অনভিজাত সমাজে আশ্রয় নেয়।

বণিক সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের বীতরাগ

করুণাময় বুদ্ধদেবের সময় থেকেই বৌদ্ধধর্মের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বণিক সম্প্রদায়। যে কোনো ক্ষেত্রে জনমত সুসংগঠিত করতে হলে প্রয়োজন হয় অর্থের। বণিক সমাজ সেই দায়িত্ব পালন করেন। বৌদ্ধধর্ম প্রসারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বুদ্ধদেবের প্রথম ‘দ্বিবাচিক’ শিষ্য ছিলেন উৎকলবাসী দুই বণিক তপসু ও ভল্লিক। পরবর্তীকালে বারাণসীর, বৈশালীর, রাজগৃহের ধনী শ্রেষ্ঠীগণ ধর্মপ্রসারে বহু অর্থদান করেছিলেন। বিশেষ করে সুদন্ত, যশ প্রমুখ শ্রেষ্ঠীদের নাম পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষও প্রীতিময়, স্বার্থহীন এই ধর্মের ছত্রছায়ায় এসেছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধসংঘে নারীর প্রবেশ প্রথম দিকে এই ধর্মকে খুব বেশি নেতিবাচক প্রভাব না

ফেললেও খ্রীষ্টীয় পঞ্চম থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মকে বিবর্ণ করেছিল। ধর্মে প্রবেশ করেছিল নেতিবাচক জীবন দর্শন। জীবনী শক্তির বিনাশকেই তারা আনন্দের উৎসার বলে ধরে নিয়েছিল। ভারতীয় জনমানস এই অবক্ষয়গ্রস্ত ধর্মের প্রতি বীতরাগ হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ যথার্থই লিখেছেন— ‘ভারতবর্ষে এমন হয়েছিল যে, কালক্রমে বুদ্ধের অনুগামীরা তাঁর নাস্তিভাবমূলক উপদেশগুলির প্রতি বেশি মাত্রায় আকৃষ্ট হয়। ফলে তাদের ধর্মের অধঃগতি অবশ্যস্বাবী হয়েছিল। নাস্তিক ভাবের প্রকোপে সত্যের অস্তিত্বভাবমূলক দিকটা চাপা পড়ে যায় এবং সেই কারণেই বুদ্ধের নামে যে সব বিনাশমূলক মনোভাব আবির্ভূত হয়েছিল ভারতবর্ষ সেগুলি প্রত্যাখ্যান করে। ভারতের জাতীয় ভাবধারার অনুশাসনই এই।’<sup>১২২</sup> মানুষ তাই আবার ইতিবাচক জীবন দর্শনকে গ্রহণ করেছিল। সাম্য না থাকলেও অন্তত নব্য ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন তাদের কাছে অবক্ষয়িত বৌদ্ধ ধর্মের চেয়ে ভালো মনে হয়েছিল। আবার ইসলাম ধর্মের সাম্য ও শাসক শক্তির আশ্রয়ে থাকার সুযোগ সুবিধার কারণে বহু অন্ত্যজ বৌদ্ধ মুসলমান ধর্মগ্রহণ করেছিল।

### মুসলমানদের আক্রমণ

বৌদ্ধধর্ম ধ্বংসের জন্য উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য এই ধর্মের প্রদীপ যখন নিষ্প্রভ, তখন বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসযজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় মুসলমানদের আক্রমণে। এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমত — ‘আসল ভিক্ষুরা বিহারে থাকিতেন। বিহারের জমিজমার আয় হইতে কোনোরূপে দিন গুজরান করিতেন। ক্রমে রাজারা প্রায় বিধর্মী হইয়া উঠিল। বৌদ্ধপণ্ডিত হইলে যে রাজসন্মান পাইবেন তাহার উপায় রহিল না। রাজাও ছোটো ছোটো রাজা — আপনাদের পণ্ডিত পোষণ করিয়া আবার যে বিধর্মী বৌদ্ধ পণ্ডিত

প্রতিপালন করিবেন, তাঁহাদের সে সাধ্য ছিল না — থাকলেও তাঁহাদের পণ্ডিতেরা তাহা করিতে দিত না। সুতরাং আসল ভিক্ষুদের এবং তাঁহাদের বিহারের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। এমন সময় আফগানিস্তানের উপত্যকা হইতে পাঠানেরা মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইয়া এবং মুসলমান ধর্ম প্রচারের জন্য কোমর বাঁধিয়া অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাফের বলিয়া তাহাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য বঙ্গদেশে আসিয়া পড়িলেন। ... তখন বাংলায় তো সেন বংশের রাজা — কিন্তু বড়ো রাজা মাত্র। আশে পাশে চারিদিকে অনেক ছোটো ছোটো রাজা ছিলেন। তাহাদের কেহ কেহ বৌদ্ধও ছিলেন। বঙ্গালের সময় ব্রাহ্মণদের একটা আদমসুমারী লওয়া হয়। সে মসয় রাঢ়ী ও বারেন্দ্রী আটশত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। আটশত ঘর ব্রাহ্মণে যতটুকু হিন্দু করিয়া লইতে পারে, দেশের ততটুকু হিন্দু ছিল, অবশিষ্ট সবই বৌদ্ধ। বৌদ্ধরা পুতুল পূজা খুব করিত। সুতরাং মুসলমান আক্রমণের রোকটা বৌদ্ধদের উপরেই পড়িয়া গেল। তাঁহারা বৌদ্ধদের বিহারগুলি সব ভাঙিয়া ফেলিলেন। এক ওদন্তপুরী বিহারেই দুই হাজার আসল ভিক্ষু বধ হইল। বিহারটি ভাঙিয়া ফেলা হইল, পাথরের মূর্তিগুলি ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলা হইল; সোনা রূপা তামা পিতল কাঁসার মূর্তিগুলি গলাইয়া ফেলা হইল; পুঁথিগুলি পোড়াইয়া দেওয়া হইল। বিক্রমশীল বিহারেরও এই দশাই হইয়াছিল। নালন্দা, জগদল প্রভৃতি বড় বড় বিহারের এই দশা হইল। ... আসল ভিক্ষু এই সময় হইতেই একরূপ লোপ হইয়াছে। যাঁহারা পলাইয়াছিল তাহারা নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়ায় চলিয়া গিয়াছিল, কতক বর্মায় সিংহলে গিয়াছিল। সুতরাং বাংলায় বৌদ্ধদের বিদ্যাবুদ্ধি, পুঁথি-পাঁজির এই পর্যন্ত শেষ।

এক এক বার মনে হয় তিন চারিশতবৎসর ধরিয়া বৌদ্ধরা ইন্দিয়াসক্ত, কুকর্মান্বিত ও ভূত প্রেতের উপাসক হইয়া যে নিজে অধঃপাতে গিয়েছিল এবং দেশটাকে শুদ্ধ অধঃপাতে দিয়াছিল, মুসলমান আক্রমণ তাহারই

প্রায়শ্চিত্ত।”<sup>২০</sup> বস্তুত, মুসলমান আক্রমণের পর বিহারকেন্দ্রিক বৌদ্ধধর্ম চর্চা সম্পূর্ণ লোপ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে একই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনে হিন্দুধর্ম ও মুসলমান ধর্ম—দুই ধর্মের দ্রুত প্রসার ঘটে। মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা মূর্তিপূজায় বিরোধী হওয়ায় কিছু কিছু বৌদ্ধ স্থাপত্য-মঠ থেকে মূর্তি ফেলে দিয়ে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করে এবং বাকি বহু বৌদ্ধ মন্দির হিন্দু মন্দিরে পরিণত হয়। এই বিষয় দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন—

‘তুর্কি ও আফগান আক্রমণের ধ্বংসলীলার পরে বৌদ্ধ বিহারাদি যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, নব্য ব্রাহ্মণরা সেগুলিকে হিন্দু মন্দিরে পরিণত করলেন। বৌদ্ধসমাজে পূজিত বিভিন্ন দেবদেবীর যেমন বোধিসত্ত্ব, অবলোকিতেশ্বর, মৈত্রেয়, বজ্রতারা, মঞ্জুষ্রী, জম্বলা, প্রজ্ঞাপারমিতা ইত্যাদি বিলুপ্ত হয়ে গেলেন এবং বুদ্ধমূর্তিকে শিব, গণেশ, বিষ্ণু, সূর্য মূর্তিতে পরিবর্তিত করে হিন্দুভূত করে নিলেন; এবং হিন্দুভূত হয়েই বৌদ্ধ দেবীরা শক্তিমূর্তি, তারা, সরস্বতী, শীতলাদেবী ইত্যাদিরূপে পূজিত হলেন। পুরীর বৌদ্ধ বিহারগুলি হিন্দুভূত হয়ে জগন্নাথ ইত্যাদির মন্দিরে পরিণত হলো (বারানসী জটাশংকর শিবের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে)। কলকাতাবাসীগণ বেহালার রূপেশ্বর শিবমন্দিরে হিন্দুভূত বুদ্ধমূর্তির দর্শন সহজেই করতে পারেন।’<sup>২১</sup> অবশ্য এই পরিণাম স্বাভাবিক। পৃথিবীর ইতিহাসে যে সমস্ত ধর্ম ব্যক্তির সাধনার, ত্যাগের, কর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সব ধর্মের বিভেদ-বিভাজন-দলাদলি স্বাভাবিকভাবে হয়েছে। বৌদ্ধধর্মেও তা লক্ষ করা যায়। তবে ভারতবর্ষে এই ধর্মের উত্থান-বিকাশ-বিস্তার হয়েও এই দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রায় লোপ পেয়েছে — এই বেদনাময় পরিণতি বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটেনি।

তথ্যসূত্র

১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধবিদ্যা। মহাবোধি বুক এজেন্সি, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১০, কলকাতা - ৭৩।
২. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বৌদ্ধধর্ম। করুণা প্রকাশনী, বৈশাখ, ১৪০৫, কলকাতা- ৯।
৩. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ : বুদ্ধদেব। করুণা প্রকাশনী, শ্রাবণ ১৪০৩, কলকাতা - ৯।
৪. ড. অমূল্যচন্দ্র সেন : বুদ্ধকথা। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০০১, কলকাতা - ৭৩।
৫. ধর্মানন্দ কোশাখী, অনুবাদ চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য : ভগবান বুদ্ধ। সাহিত্য অকাদেমি, ২০০১।
৬. শান্তিকুসুম দাশগুপ্ত : বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৯৯৮, কলকাতা - ৭৩।
৭. ডাঃ রামদাস সেন, ভূমিকা - বারিদবরণ ঘোষ : বুদ্ধদেব তাঁহার জীবন ও ধর্মনীতি। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা - ৯।
৮. অঘোরনাথ গুপ্ত, সম্পাদনা - বারিদবরণ ঘোষ : শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা - ৯।
৯. কৃষ্ণবিহারী সেন, সম্পাদনা - বারিদবরণ ঘোষ : অশোক চরিত। করুণা প্রকাশনী, ২০০৪, কলকাতা-৯।
১০. সাধনকমল চৌধুরী : প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ও গৌতমবুদ্ধ। করুণা প্রকাশনী, ২০০০, কলকাতা-৯।
১১. অরুণকান্তিসাহা : অমিতাভবুদ্ধ। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, ১৩৮৯, কলকাতা - ৯।
১২. সাধনকমল চৌধুরী সম্পাদিত ও ভাষান্তর : মহাবগ্গ। করুণা প্রকাশনী, ২০০৭, কলকাতা-৯।
১৩. সাধনকমল চৌধুরী সম্পাদিত ও ভাষান্তর : চুল্লবগ্গ। করুণা প্রকাশনী, ১লা বৈশাখ ১৪১৮, কলকাতা-৯।
১৪. সাধনকমল চৌধুরী সম্পাদিত ও ভাষান্তর : মহাবংশ। করুণা প্রকাশনী, ১৪১২, কলকাতা-৯।



## বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম

১৫. সাধনকমল চৌধুরী সম্পাদিত ও ভাষান্তর : ধূপবংশ। করুণা প্রকাশনী, বইমেলা, ২০০৫, কলকাতা-৯।
১৬. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া : বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব। বাংলা একাডেমী ঢাকা, জুন, ১৯৯৩।
১৭. বিমলাচরণ লাহা (অনুবাদ) : সৌন্দর্যানন্দ কাব্য। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০০৩, কলকাতা-৭৩।
১৮. কবি অশ্বঘোষ, সম্পাদনা ড. জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায় : বুদ্ধচরিত। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮, কলিকাতা - ৬।
১৯. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ : বুদ্ধদেব। করুণা প্রকাশনী, শ্রাবণ ১৪০৩, কলকাতা - ৯ পৃষ্ঠা - ৪৬।
২০. LIFE AND TEACHING - C.V. JOSHI, 2500 YEARS OF BUDDHISM - EDITOR-P.V. BAPAT, PUBLICATIONS DIVISION--MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING GOVERNMENT OF INDIA, FIFTH REPRINT, SEP.-1987, PG-18.
২১. শান্তিকুসুম দাশগুপ্ত : বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৯৯৮, কলকাতা- ৭৩ পৃ.-১২
২২. অঘোরনাথ গুপ্ত, সম্পাদনা - বারিদবরণ ঘোষ : শাক্যমুনিচরিত ও নির্মানতত্ত্ব। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা - ৯, পৃ.-২২
২৩. কপিলাবস্তু নগরটি বাণিজ্যপথ উত্তরাপথের রোহিনী নদীতীরে প্রতিষ্ঠিত একটি সমৃদ্ধ জনপদ। অবশ্য প্রাচীন কপিলাবস্তু নগরীর ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। দেবলা মিত্র এ বিষয় বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে নেপালের অন্তর্গত প্রাচীন কপিলাবস্তুর অবস্থান ঠিক নয়। বর্তমান উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলার পিপ্রাহ নামক ছোট শহরের চারিদিকে যে সমস্ত ধ্বংসস্তুপ আছে, সেই অঞ্চলেই প্রাচীন কপিলাবস্তু অবস্থিত ছিল। এ বিষয় শরৎকুমার রায় লিখেছেন — অযোধ্যা থেকে ১৫ মাইল উত্তর পূর্বে এবং বারানসী থেকে শতাধিক মাইল উত্তরে। অন্যতম নেপাল রাজ্যের মানচিত্র অনুসারে কপিলাবস্তুর বর্তমান নাম শিউপুর এবং শহরটি নেপাল রাজ্যের কপিলাবস্তু জেলার অন্তর্গত। তবে লুধীনাতে বুদ্ধদেবের জন্মস্থানে সষাট অশোক যে স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন তা আজও বিদ্যমান।

তথ্যসূত্র

১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধবিদ্যা। মহাবোধি বুক এজেন্সি, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১০, কলকাতা - ৭৩।
২. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বৌদ্ধধর্ম। করুণা প্রকাশনী, বৈশাখ, ১৪০৫, কলকাতা - ৯।
৩. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ : বুদ্ধদেব। করুণা প্রকাশনী, শ্রাবণ ১৪০৩, কলকাতা - ৯।
৪. ড. অমূল্যচন্দ্র সেন : বুদ্ধকথা। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০০১, কলকাতা - ৭৩।
৫. ধর্মানন্দ কোশাযী, অনুবাদ চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য : ভগবান বুদ্ধ। সাহিত্য অকাদেমি, ২০০১।
৬. শান্তিকুসুম দাশগুপ্ত : বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৯৯৮, কলকাতা - ৭৩।
৭. ডাঃ রামদাস সেন, ভূমিকা - বারিদবরণ ঘোষ : বুদ্ধদেব তাঁহার জীবন ও ধর্মনীতি। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা - ৯।
৮. অঘোরনাথ গুপ্ত, সম্পাদনা - বারিদবরণ ঘোষ : শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা - ৯।
৯. কৃষ্ণবিহারী সেন, সম্পাদনা - বারিদবরণ ঘোষ : অশোক চরিত। করুণা প্রকাশনী, ২০০৪, কলকাতা-৯।
১০. সাধনকমল চৌধুরী : প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ও গৌতমবুদ্ধ। করুণা প্রকাশনী, ২০০০, কলকাতা-৯।
১১. অরুণকান্তিসাহা : অমিতাভবুদ্ধ। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, ১৩৮৯, কলকাতা - ৯।
১২. সাধনকমল চৌধুরী সম্পাদিত ও ভাষান্তর : মহাবগ্গ। করুণা প্রকাশনী, ২০০৭, কলকাতা-৯।
১৩. সাধনকমল চৌধুরী সম্পাদিত ও ভাষান্তর : চুল্লবগ্গ। করুণা প্রকাশনী, ১লা বৈশাখ ১৪১৮, কলকাতা-৯।
১৪. সাধনকমল চৌধুরী সম্পাদিত ও ভাষান্তর : মহাবংশ। করুণা প্রকাশনী, ১৪১২, কলকাতা-৯।

## বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম

১৫. সাধনকমল চৌধুরী সম্পাদিত ও ভাষান্তর : ধূপবংশ। করুণা প্রকাশনী, বইমেলা, ২০০৫, কলকাতা-৯।
১৬. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া : বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব। বাংলা একাডেমী ঢাকা, জুন, ১৯৯৩।
১৭. বিমলাচরণ লাহা (অনুবাদ) : সৌন্দর্যানন্দ কাব্য। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০০৩, কলকাতা-৭৩।
১৮. কবি অশ্বঘোষ, সম্পাদনা ড. জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায় : বুদ্ধচরিত। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮, কলিকাতা - ৬।
১৯. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ : বুদ্ধদেব। করুণা প্রকাশনী, শ্রাবণ ১৪০৩, কলকাতা - ৯ পৃষ্ঠা - ৪৬।
২০. LIFE AND TEACHING - C.V. JOSHI, 2500 YEARS OF BUDDHISM - EDITOR-P.V. BAPAT, PUBLICATIONS DIVISION--MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING GOVERNMENT OF INDIA, FIFTH REPRINT, SEP.-1987, PG.-18.
২১. শান্তিকুসুম দাশগুপ্ত : বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৯৯৮, কলকাতা- ৭৩ পৃ.-১২
২২. অঘোরনাথ গুপ্ত, সম্পাদনা - বারিদবরণ ঘোষ : শাক্যমুনিচরিত ও নির্মানতত্ত্ব। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা - ৯, পৃ.-২২
২৩. কপিলাবস্তু নগরটি বাণিজ্যপথ উত্তরাপথের রোহিনী নদীতীরে প্রতিষ্ঠিত একটি সমৃদ্ধ জনপদ। অবশ্য প্রাচীন কপিলাবস্তু নগরীর ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। দেবলা মিত্র এ বিষয় বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে নেপালের অন্তর্গত প্রাচীন কপিলাবস্তুর অবস্থান ঠিক নয়। বর্তমান উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলার পিপ্রাহ নামক ছোট শহরের চারিদিকে যে সমস্ত ধ্বংসস্তুপ আছে, সেই অঞ্চলেই প্রাচীন কপিলাবস্তু অবস্থিত ছিল। এ বিষয় শরৎকুমার রায় লিখেছেন — অযোধ্যা থেকে ১৫ মাইল উত্তর পূর্বে এবং বারানসী থেকে শতাধিক মাইল উত্তরে। অন্যতম নেপাল রাজ্যের মানচিত্র অনুসারে কপিলাবস্তুর বর্তমান নাম শিউপুর এবং শহরটি নেপাল রাজ্যের কপিলাবস্তু জেলার অন্তর্গত। তবে লুধীনীতে বুদ্ধদেবের জন্মস্থানে সশ্রুতি অশোক যে স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন তা আজও বিদ্যমান।

২৪. গৌতমের জন্মতারিখ সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। দেওয়ান বাহাদুর স্বামিকম্বু পিল্লের মতে বুদ্ধের পরিনির্বাণ খৃষ্টপূর্ব ৪৭৮ অব্দে হইয়াছিল। অন্য কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন যে, তাহা খৃষ্টপূর্ব ৪৮৭-৪৭ অব্দে হইয়াছিল। কিন্তু আজকাল যে নতুন তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাহা হইতে নিশ্চয়পূর্ব বলা যায় যে, মহাবংশে এবং দীপবংশে বুদ্ধের পরিনির্বাণের যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহাই নির্ভুল তারিখ। এইসব গ্রন্থ হইতে প্রমাণ হয় যে, বুদ্ধের পরিনির্বাণ খৃষ্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে হইয়াছিল এবং তাহার পরিনির্বাণের তারিখ মানিয়া লইলে বুদ্ধের জন্ম খৃষ্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে হইয়াছিল এইরূপ বলিতে হইবে। (ভগবান বুদ্ধ-ধর্মানন্দ কোশম্বী, অনুবাদ-চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য..... পৃ.-৫৩।
২৫. অমূল্য সেন তাঁর বুদ্ধকথা গ্রন্থে লিখেছেন সিদ্ধার্থের জন্মের সাতদিন (অর্থাৎ কিছুদিন) পরে মায়াদেবীর মৃত্যু হইল। মায়াদেবী ভগিনী (শুদ্ধোদনের অন্যতম পত্নী) শিশুর পালনভার লইলেন। ইহার নাম কি ছিল জানা যায় না। শাস্ত্রে ইহাকে মহাপ্রজাপতি গৌতমী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কারণ ইনি বুদ্ধের মত বিখ্যাত প্রজা অর্থাৎ সন্তানকে পালন করিয়াছিলেন। পৃ.-১৩।
২৬. প্রাচীন পালি শাস্ত্রে শুদ্ধোদনকে কোথাও রাজা বলা হয় নাই, মাত্র শাক্য শুদ্ধোদন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শুদ্ধোদনের জমিতে ভাল ধান জন্মিত, কেহ বলে এই জন্য তাহার নাম শুদ্ধ ওদন হইয়াছিল। অনেক পালি বর্ণনা ও গল্পে কপিলাবস্তুর ধান্যসমৃদ্ধির ও শাক্যদের ধান্যক্ষেত্রের উল্লেখ দেখা যায়। শাক্যরা কার্যত স্বাধীন হইলেও কোশলের অধীন ছিল। বুদ্ধকথা, পৃষ্ঠা-৯।
২৭. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ : বুদ্ধদেব। করুণা প্রকাশনী, শ্রাবণ ১৪০৩, কলকাতা-৯ পৃ.-৬৫।
২৮. ড. অমূল্যচন্দ্র সেন : বুদ্ধকথা। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০০১, কলকাতা -৭৩, পৃ.-১৪।
২৯. শান্তিকুসুম দাশগুপ্ত : বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৯৯৮, কলকাতা- ৭৩ পৃ.-১৬।
৩০. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ : বুদ্ধদেব। করুণা প্রকাশনী, শ্রাবণ ১৪০৩, কলকাতা-৯ পৃ.-৭১।

## বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম

৩১. ড. অমূল্যচন্দ্র সেন : বুদ্ধকথা। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০০১, কলকাতা -৭৩, পৃ.-১৬।
৩২. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ : বুদ্ধদেব। করুণা প্রকাশনী, শ্রাবণ ১৪০৩, কলকাতা-৯ পৃ.-৭৪।
৩৩. অন্যমতে বৈশালীর অনুপ্রিয়া নামক গ্রামে ছন্দককে বিদায় দিয়েছিলেন। অঙ্গের ভূষণ ত্যাগ করিয়া ছন্দকের হাতে দিয়া তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধকথা- পৃ.-২৩।
৩৪. ড. অমূল্যচন্দ্র সেন : বুদ্ধকথা। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০০১, কলকাতা -৭৩, পৃ.-২৫।
৩৫. পাঁচজন হলেন - কৌণ্ডিন্য, অশ্বজিৎ, রাসগ, মহানাম, ভদ্র, ভিন্ন মত — বপ্র, ভদ্রিয়, অশ্বজিৎ, মহানাম, কৌণ্ডিন্য।
৩৬. ড. অমূল্যচন্দ্র সেন : বুদ্ধকথা। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০০১, কলকাতা -৭৩, পৃ.-২৬।
৩৭. যদি ক্যানিংহাম দুটি নদীকে একটি নদী হিসাব উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন — The river is now caled phalgu, opposite Gaya, and the name of lirajan or Nilanjan, is restricted of the western branch, which join the mohana 5 miles above Gaya, (Cunningham's Ancient Geography of India, Page - 457-58)
৩৮. শরৎকুমার রায় : বুদ্ধের জীবন ও বাণী। দে বুক স্টোর, কলকাতা - ৭২, পৃ.-১৯।
৩৯. অঘোরনাথ গুপ্ত, সম্পাদনা - বারিদবরণ ঘোষ : শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা -৯, পৃ.-৬৮।
৪০. বুদ্ধচরিত গ্রন্থের দ্বাদশ স্বর্গের ১০৯ সংখ্যক শ্লোকেনন্দবালার উল্লেখ আছে—  
'অথ গোপাধিপসূতা দৈবতৈরভিচোদিত।  
উদ্ধৃত হৃদয়ানন্দ তত্র নন্দ বলাগমৎ।।  
অনুবাদ : তখন গোপরাজকন্যা নন্দবালা দেবতাদের দ্বার অনুপ্রেরিত হয়ে হৃদয়ে সমুদ্রিত আনন্দ নিয়ে সেখানে গমন করলেন। (ড. জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত)

২৪. গৌতমের জন্মতারিখ সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। দেওয়ান বাহাদুর স্বামিকম্বু পিল্লের মতে বুদ্ধের পরিনির্বাণ খৃষ্টপূর্ব ৪৭৮ অব্দে হইয়াছিল। অন্য কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন যে, তাহা খৃষ্টপূর্ব ৪৮৭-৪৭ অব্দে হইয়াছিল। কিন্তু আজকাল যে নতুন তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাহা হইতে নিশ্চয়পূর্ব বলা যায় যে, মহাবংশে এবং দীপবংশে বুদ্ধের পরিনির্বাণের যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহাই নির্ভুল তারিখ। এইসব গ্রন্থ হইতে প্রমাণ হয় যে, বুদ্ধের পরিনির্বাণ খৃষ্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে হইয়াছিল এবং তাহার পরিনির্বাণের তারিখ মানিয়া লইলে বুদ্ধের জন্ম খৃষ্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে হইয়াছিল এইরূপ বলিতে হইবে। (ভগবান বুদ্ধ-ধর্মানন্দ কোশাধী, অনুবাদ-চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য..... পৃ.-৫৩।
২৫. অমূল্য সেন তাঁর বুদ্ধকথা গ্রন্থে লিখেছেন সিদ্ধার্থের জন্মের সাতদিন (অর্থাৎ কিছুদিন) পরে মায়াদেবীর মৃত্যু হইল। মায়াদেবী ভগিনী (শুদ্ধোদনের অন্যতম পত্নী) শিশুর পালনভার লইলেন। ইহার নাম কি ছিল জানা যায় না। শাস্ত্রে ইহাকে মহাপ্রজাপতি গৌতমী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কারণ ইনি বুদ্ধের মত বিখ্যাত প্রজা অর্থাৎ সন্তানকে পালন করিয়াছিলেন। পৃ.-১৩।
২৬. প্রাচীন পালি শাস্ত্রে শুদ্ধোদনকে কোথাও রাজা বলা হয় নাই, মাত্র শাক্য শুদ্ধোদন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শুদ্ধোদনের জন্মিতে ভাল ধান জন্মিত, কেহ বলে এই জন্য তাহার নাম শুদ্ধ ওদন হইয়াছিল। অনেক পালি বর্ণনা ও গল্পে কপিলাবস্তুর ধান্যসমৃদ্ধির ও শাক্যদের ধান্যক্ষেত্রের উল্লেখ দেখা যায়। শাক্যরা কার্যত স্বাধীন হইলেও কোশলের অধীন ছিল। বুদ্ধকথা, পৃষ্ঠা-৯।
২৭. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ : বুদ্ধদেব। করুণা প্রকাশনী, শ্রাবণ ১৪০৩, কলকাতা-৯ পৃ.-৬৫।
২৮. ড. অমূল্যচন্দ্র সেন : বুদ্ধকথা। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০০১, কলকাতা-৭৩, পৃ.-১৪।
২৯. শান্তিকুমুম দাশগুপ্ত : বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৯৯৮, কলকাতা- ৭৩ পৃ.-১৬।
৩০. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ : বুদ্ধদেব। করুণা প্রকাশনী, শ্রাবণ ১৪০৩, কলকাতা-৯ পৃ.-৭১।

## বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম

৩১. ড. অমূল্যচন্দ্র সেন : বুদ্ধকথা। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০০১, কলকাতা -৭৩, পৃ.-১৬।
৩২. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ : বুদ্ধদেব। করুণা প্রকাশনী, শ্রাবণ ১৪০৩, কলকাতা-৯ পৃ.-৭৪।
৩৩. অন্যমতে বৈশালীর অনুপ্রিয়া নামক গ্রামে ছন্দককে বিদায় দিয়েছিলেন। অঙ্গের ভূষণ ত্যাগ করিয়া ছন্দকের হাতে দিয়া তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধকথা- পৃ.-২৩।
৩৪. ড. অমূল্যচন্দ্র সেন : বুদ্ধকথা। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০০১, কলকাতা -৭৩, পৃ.-২৫।
৩৫. পাঁচজন হলেন - কৌণ্ডিন্য, অশ্বজিৎ, রাসগ, মহানাম, ভদ্র, ভিন্ন মত — বপ্র, ভদ্রিয়, অশ্বজিৎ, মহানাম, কৌণ্ডিন্য।
৩৬. ড. অমূল্যচন্দ্র সেন : বুদ্ধকথা। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০০১, কলকাতা -৭৩, পৃ.-২৬।
৩৭. যদি ক্যানিংহাম দুটি নদীকে একটি নদী হিসাব উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন — The river is now caled phalgu, opposite Gaya, and the name of lirajan or Nilanjan, is restricted of the western branch, which join the mohana 5 miles above Gaya, (Cunningham's Ancient Geography of India, Page - 457-58)
৩৮. শরৎকুমার রায় : বুদ্ধের জীবন ও বাণী। দে বুক স্টোর, কলকাতা - ৭২, পৃ.-১৯।
৩৯. অঘোরনাথ গুপ্ত, সম্পাদনা - বারিদবরণ ঘোষ : শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা -৯, পৃ.-৬৮।
৪০. বুদ্ধচরিত গ্রন্থের দ্বাদশ স্বর্গের ১০৯ সংখ্যক শ্লোকেনন্দবালার উল্লেখ আছে—  
'অথ গোপাধিপসূতা দৈবতৈরভিচোদিত।  
উদ্ধৃত হৃদয়ানন্দ তত্র নন্দ বলাগমৎ॥'  
অনুবাদ : তখন গোপরাজকন্যা নন্দবালা দেবতাদের দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে হৃদয়ে সমুদ্রিত আনন্দ নিয়ে সেখানে গমন করলেন। (ড. জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত)

## বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম

৪১. কবি অশ্বঘোষ, বুদ্ধচরিত, দ্বাদশ সর্গ, ১২০ সংখ্যক শ্লোক, অনুবাদ ও সম্পাদনা। ড. জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা - ৬, বৈশাখ ১৪১৫, পৃ.-৩৮৬।
৪২. অঘোরনাথ গুপ্ত, সম্পাদনা - বারিদবরণ ঘোষ : শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা - ৯, পৃ.-৭২।
৪৩. শরৎকুমার রায় : বুদ্ধের জীবন ও বাণী। দে বুক স্টোর, কলকাতা - ৭২, পৃ.-২১।
৪৪. শান্তিকুসুম দাশগুপ্ত : বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৯৯৮, কলকাতা- ৭৩ পৃ.-২৩।
৪৫. চারুচন্দ্র বসু, সম্পাদনা - ড. বারিদবরণ ঘোষ : ধ্মপদ। করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ— জানুয়ারি-১৯৯৯, পৃ.-৬৪।  
এর অনুবাদ করেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন —  
জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান,  
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ।  
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,  
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর;  
ভেঙেছে তোমার শুভ্র, চুরমার গৃহ ভিস্তি চয়,  
সংস্কার বিগতচিন্ত তৃষ্ণা আজি পাইয়াছি ক্ষয়।
৪৬. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ : বুদ্ধদেব। শ্রাবণ ১৪০৩, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা - ৯, পৃ.-৯৮।
৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুলিন বিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত : বুদ্ধদেব। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ফাল্গুন ১৪১২, পৃ.-৯।
৪৮. অমূল্যচন্দ্র সেন : বুদ্ধকথা। মহাবোধি বুক এজেন্সী, জ্যৈষ্ঠ, পুনর্মুদ্রণ ২০০১, খ্রি. পৃ.-৩৭।
৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুলিন বিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত : বুদ্ধদেব। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ফাল্গুন ১৪১২, পৃ.-৯।
৫০. চারুচন্দ্র বসু (সম্পাদিত- অনূদিত), সম্পাদনা- ড. বারিদবরণ ঘোষ : ধ্মপদ। করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ.-১৪৪।
৫১. অঘোর নাথ গুপ্ত, সম্পাদনা-বারিদবরণ ঘোষ : শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব। করুণা প্রকাশনী, পঞ্চম সংস্করণ - ১৯৯২, পৃ.-৭২।



৫২. চারুচন্দ্র বসু (সম্পাদিত- অনূদিত), সম্পাদনা- ড. বারিদবরণ ঘোষ : ধর্মপদ।  
করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ.-৯৪।
৫৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুলিন বিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত : বুদ্ধদেব। বিশ্বভারতী  
গ্রন্থন বিভাগ, ফাল্গুন ১৪১২, পৃ.-২৮।
৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুলিন বিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত : বুদ্ধদেব। বিশ্বভারতী  
গ্রন্থন বিভাগ, ফাল্গুন ১৪১২, পৃ.-২০।
৫৫. ড. সুকোমল চৌধুরী (সম্পাদনা) : গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। মহাবোধি  
বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ রাখী পূর্ণিমা, ১৪০৪ (১৯৯৭), পৃ. - ৯৫।
৫৬. চারুচন্দ্র বসু (সম্পাদিত- অনূদিত), সম্পাদনা- ড. বারিদবরণ ঘোষ : ধর্মপদ।  
করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ.-১১৫।
৫৭. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বৌদ্ধধর্ম। করুণা প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ বৈশাখ-১৪০৫,  
পৃ.-৫৭।
৫৮. ড. সুকোমল চৌধুরী (সম্পাদনা), সংযুক্ত নিকায় (২য় খণ্ড), গৌতম বুদ্ধের  
ধর্ম ও দর্শন, মহাবোধি বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ রাখী পূর্ণিমা, ১৪০৪  
(১৯৯৭), পৃ. - ৬২।
৫৯. সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : উপনিষদ গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড। বসুমতী  
কর্পোরেশন লিমিটেড, নবপর্যায় দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃ.-১২৭।
৬০. সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : উপনিষদ গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড। বসুমতী  
কর্পোরেশন লিমিটেড, নবপর্যায় দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃ.-৩৯।
৬১. স্বামী জগদানন্দ (সম্পাদিত) : শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা (দ্বিতীয় অধ্যায়)। উদ্বোধন  
কার্যালয় ডিসেম্বর ২০০০, পৃ.-৪৮।
৬২. স্বামী জগদানন্দ (সম্পাদিত) : শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা (দ্বিতীয় অধ্যায়)। উদ্বোধন  
কার্যালয় ডিসেম্বর ২০০০, পৃ.-৪৭।
৬৩. চারুচন্দ্র বসু (সম্পাদিত- অনূদিত), সম্পাদনা- ড. বারিদবরণ ঘোষ : ধর্মপদ।  
করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ.-১১৬।
৬৪. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বৌদ্ধধর্ম। করুণা প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ বৈশাখ-১৪০৫,  
পৃ.-৬৫।
৬৫. ড. সুকোমল চৌধুরী (সম্পাদনা) : গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। মহাবোধি  
বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ রাখী পূর্ণিমা, ১৪০৪ (১৯৯৭), পৃ. - ৭২।

## বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম

৬৬. Buddhist Dictionary, PP-12-13, ড. সুকোমল চৌধুরী (সম্পাদনা) : গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। মহাবোধি বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ রাখী পূর্ণিমা, ১৪০৪ (১৯৯৭), পৃ.-৭২।
৬৭. ড. সুকোমল চৌধুরী (সম্পাদনা) : গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। মহাবোধি বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ রাখী পূর্ণিমা, ১৪০৪ (১৯৯৭), পৃ.-৮০।
৬৮. চারুচন্দ্র বসু (সম্পাদিত-অনুদিত), সম্পাদনা-ড. বারিদবরণ ঘোষ : ধর্মপদ। করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ.-২।
৬৯. চারুচন্দ্র বসু (সম্পাদিত-অনুদিত), সম্পাদনা-ড. বারিদবরণ ঘোষ : ধর্মপদ। করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ.-৫২
৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুলিন বিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত : বুদ্ধদেব। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ফাল্গুন ১৪১২, পৃ.-৩২।
৭১. স্বামী অভেদানন্দ : সাংখ্য বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, বৈশাখ-১৪০৫ (১৯৯৮), পৃ.-৩০।
৭২. স্বামী জগদানন্দ (সম্পাদিত) : শ্রীমদ্ভাগবদগীতা (দ্বিতীয় অধ্যায়)। উদ্বোধন কার্যালয় ডিসেম্বর ২০০০ পৃ.-৬১।
৭৩. চারুচন্দ্র বসু (সম্পাদিত-অনুদিত), সম্পাদনা-ড. বারিদবরণ ঘোষ : ধর্মপদ। করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ.-৬৪।
৭৪. ড. সুকোমল চৌধুরী (সম্পাদনা) : গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। মহাবোধি বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ রাখী পূর্ণিমা, ১৪০৪ (১৯৯৭), পৃ.-১৬৬।
৭৫. ড. সুকোমল চৌধুরী (সম্পাদনা) : গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। মহাবোধি বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ রাখী পূর্ণিমা, ১৪০৪ (১৯৯৭), পৃ.-১৫৬।
৭৬. অঘোর নাথ গুপ্ত, সম্পাদনা-বারিদবরণ ঘোষ : শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব। করুণা প্রকাশনী, পঞ্চম সংস্করণ - ১৯৯২, পৃ.-৮৮।
৭৭. অঘোর নাথ গুপ্ত, সম্পাদনা-বারিদবরণ ঘোষ : শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব। করুণা প্রকাশনী, পঞ্চম সংস্করণ - ১৯৯২, পৃ.-৮২।
৭৮. অঘোর নাথ গুপ্ত, সম্পাদনা-বারিদবরণ ঘোষ : শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব। করুণা প্রকাশনী, পঞ্চম সংস্করণ - ১৯৯২, পৃ.-৮৯।
৭৯. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বৌদ্ধধর্ম। করুণা প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ বৈশাখ-১৪০৫, পৃ.-৭০।

## বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম

৮০. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বৌদ্ধধর্ম। করুণা প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ বৈশাখ-১৪০৫, পৃ.-৭১।
৮১. অঘোর নাথ গুপ্ত, সম্পাদনা-বারিদবরণ ঘোষ : শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব। করুণা প্রকাশনী, পঞ্চম সংস্করণ - ১৯৯২, পৃ.-৮৭।
৮২. ড. সুকোমল চৌধুরী (সম্পাদনা) : গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। মহাবোধি বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ রাখী পূর্ণিমা, ১৪০৪ (১৯৯৭), পৃ.-১৮১।
৮৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুলিন বিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত : বুদ্ধদেব। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ফাল্গুন ১৪১২, পৃ.-২৩-৩০।
৮৪. অমূল্যচন্দ্র সেন : বুদ্ধকথা। মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০০১, পৃ.-১০২।
৮৫. অমূল্যচন্দ্র সেন : বুদ্ধকথা। মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০০১, পৃ.-১০৩।
৮৬. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৪, পৃ.- ৩।
৮৭. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য : বৌদ্ধদের দেবদেবী। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৬২, পৃ.-৬।
৮৮. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য : বৌদ্ধদের দেবদেবী। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৬২, পৃ.-৯।
৮৯. ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত : জাতক, প্রথম খণ্ড। করুণা প্রকাশনী, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৪০৮, পৃ.১৪।
৯০. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভাষান্তর সত্য সৌরভ জানা : বৌদ্ধধর্মের উন্মেষ ভারতের এবং বহির্বিশ্বে। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, পৃ.-২৯।
৯১. নলিনীনাথ দাশগুপ্ত : বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম। শৈবা প্রকাশন বিভাগ, ২০০১, পৃ.- ৪৪।
৯২. ভিক্ষু সুনীথানন্দ : বাংলাদেশের বৌদ্ধবিহার ও ভিক্ষু জীবন। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ.-৩০।
৯৩. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৪, পৃ.- ২২।
৯৪. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৪, পৃ.- ২৩।
৯৫. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৪, পৃ.- ২৪।

## বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম

৬৬. Buddhist Dictionary, PP-12-13, ড. সুকোমল চৌধুরী (সম্পাদনা) : গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। মহাবোধি বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ রাখী পূর্ণিমা, ১৪০৪ (১৯৯৭), পৃ.-৭২।
৬৭. ড. সুকোমল চৌধুরী (সম্পাদনা) : গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। মহাবোধি বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ রাখী পূর্ণিমা, ১৪০৪ (১৯৯৭), পৃ.-৮০।
৬৮. চারুচন্দ্র বসু (সম্পাদিত-অনুদিত), সম্পাদনা-ড. বারিদবরণ ঘোষ : ধ্মপদ। করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ.-২।
৬৯. চারুচন্দ্র বসু (সম্পাদিত-অনুদিত), সম্পাদনা-ড. বারিদবরণ ঘোষ : ধ্মপদ। করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ.-৫২
৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুলিন বিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত : বুদ্ধদেব। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ফাল্গুন ১৪১২, পৃ.-৩২।
৭১. স্বামী অভেদানন্দ : সাংখ্য বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, বৈশাখ-১৪০৫ (১৯৯৮), পৃ.-৩০।
৭২. স্বামী জগদানন্দ (সম্পাদিত) : শ্রীমদ্ভাগবদগীতা (দ্বিতীয় অধ্যায়)। উদ্বোধন কার্যালয় ডিসেম্বর ২০০০ পৃ.-৬১।
৭৩. চারুচন্দ্র বসু (সম্পাদিত-অনুদিত), সম্পাদনা-ড. বারিদবরণ ঘোষ : ধ্মপদ। করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ.-৬৪।
৭৪. ড. সুকোমল চৌধুরী (সম্পাদনা) : গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। মহাবোধি বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ রাখী পূর্ণিমা, ১৪০৪ (১৯৯৭), পৃ.-১৬৬।
৭৫. ড. সুকোমল চৌধুরী (সম্পাদনা) : গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। মহাবোধি বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ রাখী পূর্ণিমা, ১৪০৪ (১৯৯৭), পৃ.-১৫৬।
৭৬. অঘোর নাথ গুপ্ত, সম্পাদনা-বারিদবরণ ঘোষ : শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব। করুণা প্রকাশনী, পঞ্চম সংস্করণ - ১৯৯২, পৃ.-৮৮।
৭৭. অঘোর নাথ গুপ্ত, সম্পাদনা-বারিদবরণ ঘোষ : শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব। করুণা প্রকাশনী, পঞ্চম সংস্করণ - ১৯৯২, পৃ.-৮২।
৭৮. অঘোর নাথ গুপ্ত, সম্পাদনা-বারিদবরণ ঘোষ : শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব। করুণা প্রকাশনী, পঞ্চম সংস্করণ - ১৯৯২, পৃ.-৮৯।
৭৯. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বৌদ্ধধর্ম। করুণা প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ বৈশাখ-১৪০৫, পৃ.-৭০।

## বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম

৮০. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বৌদ্ধধর্ম। করুণা প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ বৈশাখ-১৪০৫, পৃ.-৭১।
৮১. অঘোর নাথ গুপ্ত, সম্পাদনা-বারিদবরণ ঘোষ : শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব। করুণা প্রকাশনী, পঞ্চম সংস্করণ - ১৯৯২, পৃ.-৮৭।
৮২. ড. সুকোমল চৌধুরী (সম্পাদনা) : গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। মহাবোধি বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ রাখী পূর্ণিমা, ১৪০৪ (১৯৯৭), পৃ.-১৮১।
৮৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুলিন বিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত : বুদ্ধদেব। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ফাল্গুন ১৪১২, পৃ.-২৩-৩০।
৮৪. অমূল্যচন্দ্র সেন : বুদ্ধকথা। মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০০১, পৃ.-১০২।
৮৫. অমূল্যচন্দ্র সেন : বুদ্ধকথা। মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০০১, পৃ.-১০৩।
৮৬. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৪, পৃ.- ৩।
৮৭. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য : বৌদ্ধদের দেবদেবী। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৬২, পৃ.-৬।
৮৮. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য : বৌদ্ধদের দেবদেবী। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৬২, পৃ.-৯।
৮৯. ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত : জাতক, প্রথম খণ্ড। করুণা প্রকাশনী, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৪০৮, পৃ.১৪।
৯০. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভাষান্তর সত্য সৌরভ জানা : বৌদ্ধধর্মের উন্মেষ ভারতের এবং বহির্বিশ্বে। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, পৃ.-২৯।
৯১. নলিনীনাথ দাশগুপ্ত : বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম। শৈবা প্রকাশন বিভাগ, ২০০১, পৃ.- ৪৪।
৯২. ভিন্সু সুনীথানন্দ : বাংলাদেশের বৌদ্ধবিহার ও ভিন্সু জীবন। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ.-৩০।
৯৩. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৪, পৃ.- ২২।
৯৪. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৪, পৃ.- ২৩।
৯৫. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৪, পৃ.- ২৪।

## বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম

৯৬. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৪, পৃ.- ৩১।
৯৭. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৪, পৃ.- ৩২।
৯৮. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৪, পৃ.- ৩৩।
৯৯. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৪, পৃ.- ৩৪।
১০০. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৪, পৃ.- ৩৬।
১০১. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৪, পৃ.- ৩৮।
১০২. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৪, পৃ.- ৪৩।
১০৩. ড. সুকোমল চৌধুরী সম্পাদিত : গৌতমবুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। মহাবোধি বুক এজেন্সী, ১৯৯৭, পৃ.-৩৫৬।
১০৪. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৪, পৃ.- ৪৩।
১০৫. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৪, পৃ.- ৪৩।
১০৬. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৪, পৃ.- ৪৬।
১০৭. ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধবিদ্যা। মহাবোধি বুক এজেন্সী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১০, পৃ.-১৫৫।
১০৮. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, মর্মানুবাদ — গোপীমোহন সিংহরায়: বাংলা সাহিত্যে পটভূমিকারূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা, ভারবি, ১৯৯৬, পৃ.-২১।
১০৯. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, মর্মানুবাদ — গোপীমোহন সিংহরায়: বাংলা সাহিত্যে পটভূমিকারূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা, ভারবি, ১৯৯৬, পৃ.-২২।
১১০. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, মর্মানুবাদ — গোপীমোহন সিংহরায়: বাংলা সাহিত্যে পটভূমিকারূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা, ভারবি, ১৯৯৬, পৃ.-২২।

## বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম

১১১. মণিকুন্ডলা হালদার : বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস। মহাবোধি বুক এজেন্সী, ১৪১৭, পৃ.-২১১।
১১২. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, মর্ম্মানুবাদ — গোপীমোহন সিংহরায়: বাংলা সাহিত্যে পটভূমিকারূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা, ভারবি, ১৯৯৬, পৃ.২২-২৩।
১১৩. শশিভূষণ দাশগুপ্ত : বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৯০, পৃ.৯০।
১১৪. ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধবিদ্যা। মহাবোধি বুক এজেন্সী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১০, পৃ.-১৬৬।
১১৫. ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধবিদ্যা। মহাবোধি বুক এজেন্সী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১০, পৃ.-১৬৭।
১১৬. ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধবিদ্যা। মহাবোধি বুক এজেন্সী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১০, পৃ.-১৬৭।
১১৭. ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধবিদ্যা। মহাবোধি বুক এজেন্সী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১০, পৃ.-১৬৬।
১১৮. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ : ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধ্বংস, বাঙালীর ধর্ম ও দর্শন চিন্তা, প্রধান সম্পাদক, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। নবপত্র প্রকাশন, মার্চ, ১৯৮০, পৃ.-৫৬-৫৭।
১১৯. ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধবিদ্যা। মহাবোধি বুক এজেন্সী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১০, পৃ.-১৩৪।
১২০. ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধবিদ্যা। মহাবোধি বুক এজেন্সী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১০, পৃ.-১৫৩।
১২১. শ্রী শান্তিকুসুম দাশগুপ্ত : বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ। মহাবোধি বুক এজেন্সী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৮, পৃ.-১৩২।
১২২. প্রসূন বসু ও শচীন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, অখণ্ড বাংলা সংস্করণ, নবপত্র প্রকাশন, ১৩৯১, পৃ.-৮০৬।
১২৩. ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধবিদ্যা। মহাবোধি বুক এজেন্সী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১০, পৃ.-১৭১।
১২৪. শ্রী শান্তিকুসুম দাশগুপ্ত : বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ। মহাবোধি বুক এজেন্সী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৮, পৃ.-১৪০।

## বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম

### সহায়ক গ্রন্থ

চারুচন্দ্র বসু (সম্পাদিত ও অনূদিত)

ধর্ম্যপদ। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা,  
(সম্পাদনা-বারিদবরণ ঘোষ)

১৯৯৯।

ধর্মানন্দ কোশাঙ্গী

ভগবান বুদ্ধ। সাহিত্য অকাদেমি, নতুন  
(অনুবাদ - চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য) দিল্লি,  
২০০১।

নলিনীনাথ দাশগুপ্ত

বাস্তালায় বৌদ্ধধর্ম। শৈবা প্রকাশন  
বিভাগ, কলকাতা, ২০০১।

প্রসাদকুমার মাইতি

রামকথার বিকাশের ধারা (প্রথম,  
দ্বিতীয়, তৃতীয় পর্ব)। প্যাপিরাস,  
কলকাতা, ২০০২।

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য

বৌদ্ধদের দেবদেবী। বিশ্বভারতী  
গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৬২।

বিমল চন্দ্র দত্ত

বৌদ্ধ ভারত। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ  
ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ এ্যান্ড  
কালচার, কলকাতা, ১৩৮৭।

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গঙ্গাবঙ্গ। গ্রন্থমিত্র, কলকাতা, ২০০৪।

এম. মতিউর রহমান

বৌদ্ধ দর্শন : তত্ত্ব ও যুক্তি, প্রথম খণ্ড  
ও দ্বিতীয় খণ্ড। (সংকলন ও সম্পাদনা)  
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৩।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

: বুদ্ধদেব। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়  
(পুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত)  
কলকাতা, ১৪১২।

রামদাস সেন

বুদ্ধদেব তাঁহার জীবন ও ধর্মনীতি।  
করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭।

রেবতীমোহন বড়ুয়া

বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব। ঢাকা বাংলা  
একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।



## বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম

শরৎকুমার রায়	বৌদ্ধভারত। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪০৭।
শান্তিকুসুম দাশগুপ্ত	বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ। মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৯৮।
শশিভূষণ দাশগুপ্ত	ভারতের শক্তি সাধনা ও শাস্ত্র সাহিত্য। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৬৭।
সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	বুদ্ধদেব। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪০৩।
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	বৌদ্ধধর্ম। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪০৫।
সাধন কমল চৌধুরী	প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ও গৌতমবুদ্ধ। করুণা প্রকাশনী কলকাতা, ২০০০।
সুকোমল চৌধুরী (সম্পাদনা)	গৌতমবুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৯৭।
সুনন্দা বড়ুয়া	বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।
স্বামী অভেদানন্দ	সাংখ্য বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, ১৯৯৮।
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	বৌদ্ধ বিদ্যা। মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০১০।
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	: রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড ও তৃতীয় খণ্ড)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৪।
ইংরেজি গ্রন্থ	
Brahmanda Pratap Barua	: Buddhism in Bengal, All India Federation of Bengali Buddhists, Kolkata, 2007.

- P.V. Bapat : 2500 YEARS OF BUDDHISM, Ministry of Information & Broadcasting Government of India, Delhi, 1987.
- Hemendra Bikas Chowdhury : The Buddha Dharmankur Sabha, Buddha Dharmankur Sabha, Kolkata, 1992.
- R.C. Majumdar : The History of Bengal (Volume-I, Hindu Period), The University of Dacca, Dacca, 1943.
- Sukumar Sen : History of Bengali Literature, Sahitya Akademi, Calcutta, 1992.
- Sisir Kumar Das : A History of Indian Literature (500-1399), Sahitya Akademi, Delhi, 2005.
- Sadhanchandra Sarkar : A Study of the Jatakas and the Avadana, Saraswat Library, Calcutta, 1981.
- Shashibhusan Das Gupta : Obscure Religious Cults, Firma K. L. Mukhopadhyaya, Calcutta, 1969.

